গোরস্তানে আতঙ্ক

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৩

রাস্তার পাশে গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা। অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গোরস্থানটার সামনে এসে থামল ওর ছোট ১৯৭৭ মডেল কমলা রঙের ভেগা গাড়িটা। বেরিয়ে এসে ট্রাংক খুলে একটা হাত চেপে ধরল। লম্বা, রোমশ, ভারি হাতটা। আঙুল নেই, আছে থাবা। কাঁধে নিয়ে ওটা রওনা হলো সে।

খানিক দূর এগিয়ে থামল। ঘড়ি দেখল। ন'টা বাজে। দেরি হয়ে গেছে! আরও এক ঘণ্টা আগে কিশোরের সঙ্গে দেখা করার কথা।

চট করে একটা ফোন করে আসবে নাকি? কাছাকাছি আছে টেলিফোন? আছে। শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার মাথায় একটা পুরানো নির্জন গ্যাস স্টেশনে।

হাতটা বয়ে নিয়ে দ্রুত স্টেশনটার দিকে এগোল সে। ফোনের স্লটে মুদ্রা ফেলে দিয়ে ডায়াল করল। দু'বার রিঙ হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে বলল, 'তিন গোয়েন্দা, কিশোর পাশা বলছি।'

'কিশোর, মুসা। সকাল থেকেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

'আমি জানি।'

'কি করে জানলে? অ্যানসারিং মেশিনটা চালাতে ভুলে গিয়েছিলে। সারা সকাল আমি কোন জবাব পাইনি।'

'ভুলিনি। মেশিনটা জবাব দিতে পারেনি, তার কারণ ওঅর্কশপের সমস্ত ফিউজ উড়িয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো সিসটেমে আর কত? সার্কিট ব্রেকার লাগানর সময় হয়েছে। তোমার দেরি দেখে অবশ্য বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে।'

কিশোরের এখনকার চিত্রটা কল্পনা করতে পারছে মুসা। ট্রেলার হোমের ভেতরে তিন গোয়েন্দার অফিসে পুরানো একটা ধাতব টেবিলের সামনে পুরানো সুইভেল চেয়ারে বসে আছে, টেবিলে পা তুলে দিয়ে। বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। কল্পনা করতে পার কোথায় আছি? গোরস্থানে। হান্টিংটন বীচের ড্যালটন সিমেট্রিতে। সাথে রয়েছে স্পেশাল ইফেক্টস হাতটা, 'দা সাফোকেশন টু ছবিটায় যেটা নিয়ে কাজ করছে বাবা।'

'হুঁম্‌ম্‌।'

'নিয়ে যাচ্ছি পরিচালক জ্যাক রিডারের কাছে। বাবা বলেছে, মিস্টার রিডার আমাকে একটা কাজ দেবেন। কেমন লাগছে শুনতে?'

'ভাল। তবে সাবধান।'

'কেন?'

'প্রথম সাফোকেশন ছবিটা করার সময় অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।'

'যেমন?'

কথা বলার সময় শেষ হয়ে গেল। সঙ্কেত দিতে লাগল যন্ত্র। পকেট হাতড়ে আর কোন মুদ্রা পেল না মুসা।

'পরে কথা বলব,' বুঝতে পেরে বলল কিশোর। 'তোমার কাছে পয়সা নেই বুঝেছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

পকেট বোঝাই করে মুদ্রা রাখবে এরপর থেকে, রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল মুসা। রওনা হলো গোরস্থানের দিকে। কিশোরকে ফোন করে মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। কি ঘটনা ঘটে ছিল সাফোকেশন ছবিটা করার সময়?

রাস্তা পেরিয়ে এসে গোরস্থানে ঢুকল মুসা। ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। গোরস্থান তার কাছে আতঙ্কের জায়গা, দেখলেই গা শিরশির করে ভূতের ভয়ে, তবে এখন অতটা লাগছে না। লোকে গিজগিজ করছে।

প্রথম ঢালের নিচে এক চিলতে সমতল জায়গায় অনেকগুলো কবর, পাথরের ফলক লাগানো রয়েছে। তারপর আবার নেমেছে ঢাল। আরেকটা সমতল জায়গায় আরও কতগুলো কবর। তার পরে আবার ঢাল, আবার কবর, আবার ঢাল··· এভাবেই নামতে নামতে নেমে গেছে উপত্যকায়। সিনেমার লোকজন রয়েছে ওখানে। খানিকটা ওপরে ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু উৎসাহী দর্শক, শুটিং দেখতে এসেছে।

দর্শকদের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েকে দেখতে পেল মুসা, ওরই বয়েসী। একজন বিনোকিউলার দিয়ে নিচের দৃশ্য দেখছে।

'এখন কি করছে?' জিজ্ঞেস করল অন্য মেয়েটা।

'কবর খুঁড়ছে আর কথা বলছে, আগের মতই।'

'ওকে দেখা যায়? বেন ডিলনকে? আমি আসলে ওকে দেখতেই এসেছি। যা নীল চোখ না, তাকালেই কেন জানি ধক করে ওঠে বুক।'

'তাহলে তোর কপাল খারাপ, ওকে না দেখেই ফেরত যেতে হবে।'

আপনমনেই হাসল মুসা। ছবির শুটিং কখনও দেখেনি নাকি মেয়েগুলো? কথাবার্তায় সে রকমই লাগছে। হলিউডের নতুন মুভি সুপারস্টার বেন ডিলনও দেখেনি বোঝা যাচ্ছে। এই মুভি স্টারদের নিয়ে সমস্যা, জানে মুসা। ওর বাবা বলেন, কিছুতেই ওদেরকে সময়মত সেটে হাজির করানো যায় না।

শুটিং স্পটের কাছে নেমে এল মুসা। সাফোকেশন-২ হরর ছবি। মরে গেছে ভেবে ভুল করে একটা লোককে কবর দিয়ে ফেলা হয় এই গল্পে, তারপর লোকটা বেরিয়ে এসে জোম্বি হয়ে যায়। ভীষণ রোমাঞ্চকর।

শুটিং স্পটেই ৩৮ বছর বয়স্ক ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা পরিচালক জ্যাক রিডারের দেখা পেল মুসা। মস্ত একটা পাথরের ফলকের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে পোর্টেবল টেলিফোনে কথা বলছেন। কালো কুচকুচে চুলের সঙ্গে মানিয়ে গেছে পরনের কালো টার্টলনেক সোয়েটার আর কালো প্যান্ট।

'বেন কোথায়?' টেলিফোনে গর্জে উঠলেন রিডার। 'বার বার কথা দিল আসবে, অথচ...এগুলোর কোনটাকে বিশ্বাস নেই!' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তার এজেন্ট, সে জন্যেই তোমাকে বলছি। দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি, দেখা নেই। এমন করলে কেমন লাগে! জলদি পাঠাও!' লাইন কেটে দিয়ে টেলিফোনটা ছুঁড়ে দিলেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের দিকে। লাল চুল পনি টেল অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে মেয়েটা।

রিডার সম্পর্কে বাবা যা বলেছেন, সব ঠিক—এসেই প্রমাণ পেয়ে গেল মুসা। বদমেজাজী, নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন, কাজ আদায় করে নিতে চান। তবে দর্শকদের মতে ছবি ততটা ভাল হয় না, জনপ্রিয়তা পায়নি কোনটাই, একটা বাদে। ছবিটার নাম 'মণ্ডো গ্রসো'। বক্স অফিস হিট করেছে।

লাল চুল মেয়েটাকে আদেশ দিলেন রিডার, 'পাম, ব্যাটার বীচ হাউসে ফোন করে দেখো। আছে হয়তো ওখানেই...' মুসার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। 'কী?'

রোমশ হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুসা বলল, 'আমি মুসা আমান। এটা পাঠিয়েছে বাবা। আপনাকে বলতে বলে দিয়েছে, পোড়ালে এক এক করে তিনটে পরতে খুলে যাবে হাতটা। প্রথমে দেখা যাবে মাংসের রঙ, তারপর সবুজ রঙ—গোটা গোটা বেরিয়ে থাকবে, সব শেষে লাল একটা স্তর, অনেকগুলো রগ বের হওয়া।'

হাতটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম হাসি ফুটল রিডারের মুখে। 'চমৎকার! খুব সুন্দর! তোমার বাবা সত্যি কাজ বোঝে।' হাতটা একজন প্রোডাকশন অ্যাসিসটেন্টকে দিয়ে আবার মুসার দিকে ফিরলেন তিনি।

'স্কুল নেই আজ তোমার?'

'না। স্যারেরা জরুরি মিটিঙে বসবেন।'

'ও। তোমার বাবার কাছে শুনলাম, গাড়িটাড়ি নাকি খুব ভাল চেনো তুমি? সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'গুড। গাড়ির একটা বিশেষ দৃশ্য দেখাতে চাই ছবিতে। সাহায্য করতে পারবে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আমার এক বন্ধু আছে, নিকি পাঞ্চ, সে আর আমি মিলে যে কোন গাড়িকে কথা বলাতে পারি।'

'কথা বলানোর দরকার নেই আপাতত। রক্ত বের করতে পারবে?'

তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'উইণ্ডশীল্ড ওয়াশার থেকে রক্ত বের করতে হবে,' বললেন পরিচালক। 'চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলে চলবে না, বেরোতে হবে ভলকে ভলকে, ধমনী কেটে গেলে যেমন হয়। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, আবার কমে যায়, বেরিয়ে আসে, কমে যায়।'

মুসার ঘাড়ের একটা জায়গায় আঙুল ঠেসে ধরলেন তিনি। শিউরে উঠল মুসা।

'গলার শিরা কেটে গেলে কি হয়?' বললেন তিনি, 'হৃৎপিণ্ডের রক্ত পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে পিচকারি দিয়ে পাম্প করার মত রক্ত বেরোয়, কমে যায়, আবার বেরোয়। তেমনি করে বের করতে হবে। প্রথমে অনেক বেশি, আস্তে আস্তে কমে আসবে। পারবে?'

'কি গাড়ি?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জাগুয়ার এক্স জে সিক্স।'

চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে মুসা। পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার দাম হবে একটা গাড়ির!

'পারব,' জবাব দিল সে।

'ও-কে। হলিউডের এক্সক্লুসিভ কারসের সঙ্গে কথা হয়ে আছে আমার। গিয়ে শুধু বলবে কি জিনিস চাও। পেয়ে যাবে। সোমবারের মধ্যে গাড়ি নিয়ে তোমাকে হাজির দেখতে চাই।' পামের দিকে ফিরলেন পরিচালক।

'পাচ্ছি না, মিস্টার রিডার,' জানাল মেয়েটা, 'লাইন এনগেজ।'

পামের হাত থেকে সেটটা কেড়ে নিয়ে প্রায় আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখলেন রিডার। আরেক অ্যাসিসটেন্টের দিকে ফিরে ধমকের সুরে বললেন, 'মারফি, আমার গাড়িটা নিয়ে তুমি আর পাম চলে যাও বেনের বাড়িতে, ম্যালিবু কোর্টে। প্রয়োজন হলে জোর খাটাবে। ইয়ার্কি পেয়েছে! কন্ট্রাক্ট সই করে এখন তালবাহানা! আর যে-ই করুক, আমি সহ্য করব না!'

'যাচ্ছি।' চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপর বসাতে বসাতে বলল মারফি, 'ম্যালিবু কোর্ট কোথায়? বীচ হাইওয়ের উত্তরে, না দক্ষিণে?'

কটমট করে সহকারীর দিকে তাকালেন রিডার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবেন মারফির। হরর ছবির আরেকটা দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলবেন।

'আমি চিনি,' মুসা বলল। 'ম্যালিবুর কাছেই থাকি আমরা। কোস্ট হাইওয়ের ধারে, রকি বীচে।' বেন ডিলনের সাথে দেখা করার প্রবল আগ্রহ তার।

'তাই?' রিডার বললেন, 'চলে যাও। উড়িয়ে নিয়ে এস ব্যাটাকে।' খসখস করে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে মুসাকে দিয়ে বললেন, 'এই দুটোকেও সাথে করে নিয়ে যাও। দরকার লাগতে পারে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে, চাইলে ওদের ঘাড়ে বাকিটা চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে পার। যাও।' হাত দিয়ে যেন মাছি তাড়ালেন পরিচালক।

রিডারের লাল মার্সিডিজ ৫৬০ এস ই এল গাড়িটাতে উঠল মুসা। কোমল চামড়ায় মোড়া গদি। চমৎকার গন্ধ। সামনের সিটে বসেছে পাম আর মারফি। পেছনের সিটে মুসা। নরম গদিতে দেবে গেছে শরীর। খুব আরাম। ভেতরে নানারকম যন্ত্রপাতি, অনেক সুযোগ সুবিধে। থ্রি-লাইন টেলিফোন, টিভি, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ২০০ ওয়াটের অ্যামপ্লিফায়ার আর ডলবি সাউণ্ডযুক্ত স্টেরিও সেট, ছোট রেফ্রিজারেটর, আর আরও অনেক জিনিস। মুসার দুঃখ হচ্ছে মাত্র এক ঘণ্টার পথ যেতে হবে বলে। অনেক দূরের ইনডিয়ানায় এই গাড়িতে চড়ে যেতে

পারলেই সে খুশি হত।

প্যাসিফিক কোস্টের ছোট সৈকতের কাছাকাছি এসে গতি কমাল মারফি।

'দারুণ জায়গা তো,' সৈকতের ধারের সুন্দর বাংলোগুলোর দিকে তাকিয়ে পাম বলল। 'আমার যদি এরকম একটা বাড়ি থাকত!'

'কোন দিকে যাব?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল মারফি।

'বাঁয়ে।'

মাইলখানেক চলার পর বেন ডিলনের বাড়িটা দেখা গেল। সিডার কাঠে তৈরি একতলা বাড়ি। নেমে গিয়ে বেল বাজাল মারফি। সাথে রয়েছে পাম। মুসা খানিকটা পেছনে। এতবড় একজন অভিনেতার সাথে দেখা করতে যেতে কেমন সঙ্কোচ লাগছে। কি বলবে? আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন? অ্যাডভেঞ্চার আর থ্রিলার কাহিনী ছাড়া তো অভিনয় করেন না, হরর ছবিতে করছেন কেন হঠাৎ? টাকার জন্যে? নাহ্, এসব বলা ঠিক না। তবে হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে পারে ফেরার পথে!

কয়েকবার বেল বাজিয়েও সারা পেল না মারফি। দরজায় থাবা দিতে লাগল পাম। কাজ হল না। পরস্পরের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল দু'জনে। অর্থাৎ, ব্যাপার কি?

ডোরনবে মোচড় দিল মারফি। দিয়েই অবাক হয়ে গেল। খোলা। পাল্লা খোলার আগে দ্বিধা করল। ঠেলা দিয়ে খুলে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বেন!'

জবাব নেই।

ঘরে ঢুকল মারফি আর পাম।

মুসা ভাবছে, কি হল? আরেকবার মারফিকে ডাকতে শুনল, 'অ্যাই, বেন!'

বাড়ির ভেতরের কোন ঘর থেকে ডাকটা শোনা গেল, তারপর নীরবতা। বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেল যেন সব কিছু। সতর্ক হয়ে উঠল মুসার গোয়েন্দামন। কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ঢুকে পড়ল সে। ঢুকেই থমকে গেল।

লিভিংরুমটা দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঝড় বয়ে গেছে ঘরটাতে। সমস্ত আসবাবপত্র উল্টোপাল্টা, কিছু কিছু ভাঙা। কাত হয়ে পড়ে আছে একটা ভাস্কর্য। লম্বা টেবিল ল্যাম্প আর টবে লাগান গাছের চারাগুলোও কাত হয়ে আছে মেঝেতে। জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ। থ্রিলার ছবির দৃশ্যের মতই লাগছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মারফি আর পাম। মূর্তির মত স্থির। কি করবে বুঝতে পারছে না।

'হলোটা কি?' বিড়বিড় করল পাম।

'বাকি ঘরগুলোও দেখা দরকার,' মুসা বলল।

'কেন?' মারফির প্রশ্ন।

'কি দেখব?' জিজ্ঞেস করল পাম।

আরেকবার পুরো ঘরটায় চোখ বোলাল মুসা। গম্ভীর হয়ে বলল, 'লাশ!'

দুই

'যাহ্, লাশ থাকবে কেন?' বিশ্বাস করতে পারছে না পাম।

জবাব দিল না মুসা। গণ্ডগোল যে হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছে। প্রচণ্ড লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে। অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে যেন ঘরে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করতে চাইল সে। বলল, 'আসুন, ঘুরে দেখি।'

মুসার জুতোর তলায় পড়ে কাচের টুকরো গুঁড়ো হচ্ছে। ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো। কোন জিনিস না ছুঁয়ে, যেটা যেভাবে রয়েছে না নড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। ভাবছে, কি হয়েছিল এখানে? বেডরুমে ঢুকল। ফোনের তার ছেঁড়া। ফোন করে তখন কেন জবাব পায়নি পাম, বোঝা গেল।

'বেন নেই! ডাকাতি-টাকাতি হয়নি তো?' মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

'জানি না। ডাকাতেরা ড্রয়ার আর আলমারি ঘাঁটে শুনেছি, চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলতে শুনিনি। কিছু চুরি গেল কিনা দেখে বলতে পারবেন?'

উঁচু একটা আলমারির দুটো ড্রয়ার খুলে দেখল পাম। 'ছোঁয়ওনি কিছু।'

'তোমার কথাবার্তা যেন কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মারফি। 'মনে হচ্ছে এ লাইনে অভিজ্ঞতা আছে...'

আমি গোয়েন্দা, বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। এখনই সেটা জানান বোধহয় ঠিক হবে না। তবে কিছু একটা বলা দরকার। বাঁচিয়ে দিল পাম, চলে যাওয়া উচিত...'

'এখনই কি?' আবার কাচের টুকরো মাড়িয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল মুসা। এত কাচ এল কোথা থেকে? ভাবতে গিয়ে কিশোরের একটা কথা মনে পড়ল: কি ভেঙেছে সেটা যদি বের করতে না পার, কি ভাঙেনি সেটা দেখো।'

কাচ এল কোথা থেকে বের করার জন্যে রান্নাঘরে এসে ঢুকল মুসা। আলমারি খুলে সেগুলোর অবস্থা দেখতে লাগল।

'এই, করো কি?' মুসার কাঁধ খামচে ধরল মারফি। 'বিখ্যাত অভিনেতার ঘর থেকে স্যুভনির নেয়ার মতলব?'

'কাচ ভাঙা এল কোত্থেকে দেখতে চাইছি।'

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল মারফি। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'সরি! মাথার ভেতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!'

কাচের সব জিনিসই মনে হলো ঠিক আছে, কিছু ভাঙেনি। জানালাগুলো দেখল মুসা। ভাঙা নেই একটাও। ফুলদানীও সব আস্ত। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে না ফুল কিংবা পানি।

কয়েকবার করে ঘরগুলো দেখল মুসা। কিছু বুঝতে পারল না। পারলে ভাল

হত। রহস্যের সমাধান করে অবাক করে দিতে পারত কিশোর আর রবিনকে।

কিন্তু পারল না।

গোরস্থানে ফেরার পথে চুপচাপ রইল মুসা। শুনছে মারফি আর পামের উত্তেজিত আলোচনা। নানা রকম যুক্তি খাড়া করছে ওরা। ওদের ধারণা, বাড়িটাতে ওসব ঘটার আগেই বেরিয়ে গেছে বেন। কিংবা মাতাল হয়ে এসে নিজেই ওই অবস্থা করেছে ঘরবাড়ির, শেষে রাত কাটাতে গেছে কোন মোটেলে।

ওদের এসব যুক্তি হাস্যকর লাগছে মুসার কাছে। শুনলই শুধু, কিছু বলল না। বলতে গেলে ওরাও তার মতামত শুনতে চাইবে। বলতে পারবে না সে। কিছুই ভেবে বার করতে পারেনি এখনও। কাজেই চুপ থাকতে হলো।

রিয়ার-ভিউ মিররে মুসার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মারফি, 'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?'

'না। ডানে মোড় নিয়ে তারপর দক্ষিণে।'

গোরস্থানে রিডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সদ্য খোঁড়া একটা কবরের মধ্যে। ধমক দিয়ে একজন অভিনেতাকে বোঝাচ্ছে কি করে বেলচা দিয়ে কবরের মাটি সরাতে হবে।

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ। ছিপছিপে শরীর, বেশ সুঠাম, নিয়মিত টেনিস খেলেন বা অন্য ব্যায়াম করেন বোঝা যায়। পরনের সাদা প্যান্ট আর গায়ের পিচ রঙের পোলো শার্ট রোদেপোড়া চামড়া ও ধবধবে সাদা চুলের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।

'বেন কই?' তিনজনকে ফিরতে দেখে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রিডার।

'আপনার সঙ্গে একটু একা কথা বলা যাবে?' কবরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

কবর থেকে উঠে এলেন রিডার। মুসা, মারফি আর পামের সঙ্গে সরে যেতে লাগলেন একটা নির্জন জায়গায়। পেছনে আসতে লাগলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পায়ের শব্দে মুসা ফিরে তাকাতেই হেসে আন্তরিক গলায় বললেন, 'আমি ব্রাউন অলিংগার। সাফোকেশন টু-র প্রযোজক। চেকগুলো যেহেতু আমাকেই সই করতে হবে, জানা দরকার টাকাগুলো সব পানিতে ফেলছে কিনা জ্যাক।'

দ্বিধা করল মুসা। রিডার কিছুই বললেন না। বলল সে, 'ডিলন নেই।'

মুসার চোখের দিকে তাকালেন অলিংগার। হাত বাড়িয়ে কাঁধ খামচে ধরলেন। শক্তি আছে। কানের কাছে বিপবিপ করল তাঁর হাতঘড়ির অ্যালার্ম। 'আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা, না? এমনিতেই তো চুল সব পেকে গেছে, আর কি পাকাবে? কে তুমি?'

মুসা বলার আগেই রিডার বলে দিলেন, 'ও রাফাতের ছেলে।'

'বেনের ঘরে সব তছনছ!' পাম বলল, 'যুদ্ধ করে গেছে যেন!'

'যুদ্ধ?' হাসলেন রিডার। 'বেন? একটা মাছি মারার ক্ষমতাও নেই ওর। বাহাদুরি যা দেখায় সবই ছবিতে, অভিনয়ে। পর্দায় দেখলে তো মনে হয় ওর মত নিষ্ঠুর লোক আর নেই।'

'তাহলে অন্য কেউ ওই অবস্থা করেছে বেনের ঘরের,' অলিংগার বললেন। 'ও তখন ছিল না।'

'আমারও সে রকমই ধারণা,' মারফি বলল।

'বেন সারারাত বাড়ি আসেনি,' মুসা বলল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল সবাই।

'তুমি কি করে জানলে?' পামের প্রশ্ন।

'শোবার ঘরেও তো ঢুকেছি আমরা। বিছানাটা দেখেননি? কেউ ঘুমায়নি ওতে, দেখেই বোঝা যায়।'

'চালাক ছেলে। বাপের মত।' অলিংগার বললেন, 'যাই বলো, ঘটনাটা স্বাভাবিক লাগছে না।'

অলিংগারের প্রশংসায় বুক ফুলে গেল মুসার। ভাবল, কিশোর যতই আমাকে মাথামোটা বলুক, গোয়েন্দা হিসেবে খারাপ নই আমি। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, 'মিস্টার অলিংগার, আশা করি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এখানে আরও দুটো নাম দেখছেন, ওরা আমার বন্ধু...'

'তিন গোয়েন্দা?' হাসলেন প্রযোজক। 'না, আপাতত সাহায্য লাগবে না। প্রয়োজন হলে পরে দেখা যাবে। আগে দেখি ও আসে কিনা। এখানে তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা।'

'চব্বিশ ঘণ্টা?' আঁতকে উঠলেন রিডার, 'খরচ কত বাড়বে জানেন? বরং আরেক কাজ করতে পারি। বসে না থেকে অন্য দৃশ্যের শুটিং করি, মানুষের হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে বের করার দৃশ্যটা।

'স্ক্রিপ্টে ওটা নেই, জ্যাক।'

'তাতে কি? ভাল আলো আছে। লোকজন আছে। গ্যালন গ্যালন রক্ত জোগাড় করা আছে। লোকে রক্তপাত দেখতে পছন্দ করে।'

'স্ক্রিপ্টে নেই, কাজেই বাজেটেও নেই। বাড়তি খরচ করতে পারব না।'

'ব্রাউন, ডিরেক্টর আপনি নন, আমি। কাজেই ছবি বানানোর ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে আপনাকে।'

অলিংগার জবাব দেয়ার আগেই রওনা হয়ে গেলেন রিডার। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বললেন, 'রক্তাক্ত গাড়ির কথা ভুলো না। সবুজ জাগুয়ার চাই আমি, কালচে সবুজ।'

লোকজন যেখানে অপেক্ষা করছে সেদিকে চলে গেলেন রিডার। মুসা, পাম আর মারফির দিকে তাকিয়ে হাসলেন অলিংগার। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, 'একমাত্র আমরাই জানলাম বেন ডিলন বাড়ি নেই। আর কেউ যেন না জানে। লোকে জানলে ছবির বদনাম হবে। কোন স্ক্যাণ্ডাল চাই না। এমনিতেই আলসারের রোগী আমি, দুশ্চিন্তায় থেকে সেটা আর বাড়াতে চাই না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তার পরেও বেনের খোঁজ না পেলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে তখনকারটা তখন। বুঝতে পেরেছ?'

'কেউ জানবে না,' কথা দিল পাম।

'আমরা অন্তত বলব না,' বলল মারফি।

'বেশ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো মুসা। তার ইচ্ছে ছিল চমৎকার একটা রহস্যের তদন্ত করে একাই বাজিমাত করে দিয়ে হিরো হয়ে যাবে।

'তাহলে কথা দিলে,' হাত বাড়িয়ে দিলেন অলিংগার।

বেনের উধাও হওয়ার কথা কাউকে বলতে না পারলেও এখানে শুটিং দেখায় কোন দোষ নেই। রকি বীচে ফেরার তাড়া নেই মুসার।

লাঞ্চে বসেছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান।

'আজকে আর শুটিং হবে বলে মনে হয় না,' একজন বলল খাবার চিবাতে চিবাতে। 'বেন আসছে না। অহেতুক বসে আছি আমরা।'

আরেকজন বলল, 'মনে হচ্ছে, এই ছবিটাতেও গোলমাল হবে।' ওর নাম ডজ।

'মানে?'

'মানে আর কি? তোমরা তো প্রথম সাফোকেশনে কাজ করনি, করলে বুঝতে।'

'কি বুঝতাম?'

'কি কাণ্ডটাই যে হয়েছিল! জিনে ধরেছিল যেন ছবিটাকে।'

'আরে বাবা খুলেই বল না!' অধৈর্য হয়ে বলল প্রথম টেকনিশিয়ান।

মুখের খাবারটা চিবিয়ে গিলে নিল ডজ। তারপর বলল, 'যতবারই জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটা নেয়ার চেষ্টা করলাম, কথা আটকে যেতে লাগল পরিচালকের। কিছুতেই আর বলতে পারেন না। এক অদ্ভুত কাণ্ড! যা তা ডিরেক্টর নন, শ্যাডো জিপসন। আজেবাজে প্রযোজকের কাজ করেন না তিনি, জ্যাক রিডারের মত যা পান তাই করেন না। সে-জন্যেই সাফোকেশন টু করতে রাজি হননি তিনি। প্রথম ছবির হিরো কোয়েল রিকটারও ছবিটা শেষ করার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, স্নায়বিক রোগে। পুরো একটা বছর ভুগেছে। কাজ করার সময় আমারও খারাপ লাগত। শুটিঙের সময় মাথা ঘুরত। কেন, বুঝতে পারতাম না।'

'ওসব কিছু না,' বলল অল্প বয়েসী একটা মেয়ে, সে-ও টেকনিশিয়ান, 'সব ছবির শুটিঙেই কমবেশি গোলমাল হয়।'

'তা হয়। তবে ওটার মত না। ওটাকে জিনে ধরেছিল! শুরুটা এটারও সুবিধের লাগছে না।'

এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ওরা। একসারি কবরের কাছে সরে এসে একটা ফলকে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা। ভেসে আসছে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজান বিটল্‌সের গান। রবিন আর কিশোর থাকলে এখন কি কি কথা হত, কল্পনা করতে পারছে সে। রবিন বলত বিটল্‌স্ কি ধরনের গান, কোন অ্যালবামে পাওয়া যাবে। তারপর শুরু করত বস বার্টলেট লজের কথা, তিনি কি কি গান শুনতে পছন্দ করেন, বিটল্‌স্ কতটা ভালবাসেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিশোর এসব গানবাজনার ধার দিয়েও যেত না, সে বলত মুসাকে শান্ত হয়ে চোখ খোলা রাখতে, যাতে সব কিছু

চোখে পড়ে। বোঝাত, জিন বলে কিছু নেই।

কিন্তু ওরা আজ নেই এখানে। আমাকে একাই সামলাতে হবে এই কেস। একা!

ছায়া পড়ল গায়ে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?' বলল লোকটা। লম্বা, বয়েস চল্লিশের কোঠায়, মাথার ওপরের অংশের চুল খাটো করে ছাঁটা, ঘাড়ের কাছেরগুলো লম্বা লম্বা। পরনে ঢিলাঢালা সাদা পোশাক। অনেকগুলো বেল্ট, নেকলেস আর ব্রেসলেট লাগিয়েছে গলায়, হাতে, কোমরে। সেগুলোতে লাগানো রয়েছে নানা ধরনের স্ফটিক।

রহস্যময় গলায় বলল লোকটা আবার, 'মাঝে মাঝে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই না করে গায়ের ওপর দিয়ে চলে যেতে দিতে হয়।' মুসার মুখোমুখি ঘাসের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল সে। দু'হাত দিয়ে মুসার ডান হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের নাম বলল, 'আমি পটার বোনহেড।'

'আমি মুসা আমান। আপনি কি অভিনেতা?'

হেসে উঠল লোকটা, আন্তরিক হাসি, তাতে কুটিলতা নেই। 'সারাটা সময় আমি "আমি" হতেই পছন্দ করি, অভিনেতা নয়। অন্য কোন চরিত্র নয়। তোমার ব্যাপারটা কি? এই সিনেমা- রোগীদের সঙ্গে মিশলে কি করে?'

'আমি সিনেমার লোক নই,' মুসা বলল। 'তবে এই ছবিতে একটা কাজ পেয়েছি।

গলায় ঝোলানো রূপার চেনে লাগানো লম্বা চোখা মাথাওয়ালা গোলাপী একটা স্ফটিকে আঙুল বোলাতে লাগল বোনহেড। 'এটাতে কাজ করার মানে জানো? দোরাস্তার কাছে থমকে যাওয়া। কোন দিকে যাবে বুঝতে পারবে না।

লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। আশ্চর্য! এ রকম করে কথা বলে কেন?

আবার বলল বোনহেড, 'এরকম পরিস্থিতিতে কোন দিকেই তোমার যাওয়া উচিত না। বিপদ কাটানোর ওটাই সব চেয়ে সহজ পথ।'

সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে মুসার। এসব উক্তি কোথা থেকে ধার করেছে সে? চীনা জ্যোতিষির সাগরেদ নয় তো?

গলা থেকে রূপার চেনটা খুলে নিয়ে মুসার হাতে দিতে গেল সে।

'নো, থ্যাঙ্কস,' মানা করে দিল মুসা, 'গহনা-টহনা পরতে আমার ভাল লাগে না।'

'এটা গহনা নয়,' বোনহেড বলল, 'নাও। এর সঙ্গে কথা বলো, শব্দের কাঁপুনিতেই সাড়া দেবে।' চেন থেকে স্ফটিকটা খুলে নিয়ে জোর করে মুসার হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'শুনবে, বুঝলে, কথা শুনবে স্ফটিকটার। আমি শুনেছি। এটা আমাকে বলল, এখানে একজনের ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে। কার কথা জানো? তুমি।'

'সাবধান করছেন, না হুমকি দিচ্ছেন?'

কঠিন স্বরে বলল মুসা। লোকটাকে বুঝতে দিল না বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু

হয়ে গেছে ওর। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। বেন ডিলনের ঘরেও এরকম হয়েছিল। যেন সমস্ত অক্সিজেন শুষে নেয়া হয়েছে বাতাসের। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মুসার দিকে তাকাল বোনহেড। 'ওরকম কিছু বলছি না। আমার তৃতীয় নয়ন যা দেখেছে তাই কেবল জানাতে এলাম।'

'দেখুন, সহজ করে জবাব দিন দয়া করে। আমি কি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি?'

'স্কটিকটাকে জিজ্ঞেস করো।' আর দাঁড়াল না বোনহেড।

মুঠো খুলে তালুতে রাখা গোলাপী জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। রোদ লেগে চকমক করছে। গরম হয়ে গেছে। আর বসে থাকতে পারল না। লাফিয়ে উঠে গাড়ির দিকে রওনা হলো।

তিন

যেন ঘোরের মধ্যে গাড়িটার দিকে এগোচ্ছে মুসা। এমন সব ঘটনা ঘটছে, একা আর সমাধান করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আত্মবিশ্বাস কমে আসছে। নিজের ওপর ভরসা নেই আর তেমন।

কবরগুলোর কাছ থেকে সরে এসে দেখল, একজন অভিনেত্রীর গলা টিপে ধরেছেন রিডার। দম বন্ধ করে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, বাতাসের জন্যে ছটফট করে কিভাবে মরতে হবে। পরিচালকের ভাবভঙ্গি দেখে ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল ওর। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রিডারের চেহারা। যেন অভিনয় নয়, সত্যি সত্যিই মেয়েটাকে মেরে ফেলছেন তিনি।

ঘড়ি দেখল মুসা। আজ আর জাগুয়ারটাকে আনতে যাওয়ার সময় নেই। আগামী দিন ছাড়া হবে না।

বাড়িতে এসে সোজা বেডরুমে ঢুকল। রিসিভার নামিয়ে রাখল। ফোন ধরারও মানসিকতা নেই। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। শুটিং স্পটের রহস্যগুলো মাথা গরম করে দিয়েছে ওর। ফারিহার সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে রেডিও নিয়ে পড়ে থাকা ভাল। শুনতে চায়, কোনো স্টেশন বেন ডিলনের নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ দেয় কিনা। কিন্তু ওই ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ।

পরদিন শনিবার। ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই মনে হল মুসার, কেসটা এখনও বহাল আছে তো? কাজে যোগ দিতে এসেছে ডিলন? নাকি রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে?

তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোল সে। গাড়ি নিয়ে রওনা হল পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণের ড্যালটন সিমেট্রিতে। পৌঁছে দেখল অবিকল আগের দিনের মতই দৃশ্য। পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান, শ্রমিক সবাই হাজির। কিছুই করার নেই তাদের। ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অনেক বড় একটা ফলকের ওপাশ থেকে জগিং করতে করতে বেরিয়ে এলেন

ব্রাউন অলিংগার। পরনে টেনিস খেলার সাদা হাফপ্যান্ট, গায়ে সাদা শার্ট। মুসাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে, এলে। বাবা কেমন আছে তোমার?'

'ভাল। বেন ডিলনের কোন খবর পেলেন?'

'নাহ্,' হাসিটা মিলিয়ে গেল অলিংগারের।

'পুলিশে খবর দেবেন তো?'

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করতে লাগলেন অলিংগার। হাতঘড়িটা বিপ বিপ করে অ্যালার্ম দিতে শুরু করতেই চাবি টিপে সেটা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'না। এসব অনেক দেখেছি। নাম করে ফেললেই এরকম শুরু করে। সবাইকে টেনশনে রেখে যেন মজা পায়। অবশ্যই অন্যায় করে, তবে অপরাধ নয় যে পুলিশে খবর দিতে হবে।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আর সবাই যা করে। অপেক্ষা করব, ওর আসার। গোয়েন্দা-গিরি লাগবে না। দয়া করে কিছু করতে যেও না। আমার আপত্তি আছে।'

চুপ করে ভাবতে লাগল মুসা, কি করা উচিত? কিশোর হলে কি করত? ডিলনের বাড়িতে যে সব কাণ্ড হয়ে আছে, তার কি জবাব? আর ভাঙা কাচ? তার মতে, তদন্ত একটা অবশ্যই হওয়া দরকার। এবং এখনই। কিন্তু অলিংগার যেভাবে মানা করছেন···

আবার সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। চাবি টিপে বন্ধ করে বললেন, 'আমাকে যেতে হচ্ছে। পরে কথা বলব।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। অলিংগার প্রযোজক, অনেক ছবিরই প্রযোজনা করেছেন, অভিজ্ঞতা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চেনেন অভিনেতাদেরকে। হয়ত ঠিকই বলেছেন, সময় হলেই এসে হাজির হবে ডিলন। ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এখন তার গাড়ি আনতে যাওয়া উচিত। ওটাই তার আসল কাজ।

গাড়ি চালিয়ে রাস্তার মাথায় ফোন বুদে চলে এল সে। মেরিচাচীর বোনের ছেলে, নিকি পাঞ্চকে ফোন করার জন্যে। রকি বীচে এসেছে বেশিদিন হয়নি নিকি। একেক জনের কাছে সে একেক রকম। মুসার কাছে মোটর গাড়ির জাদুকর।

রবিনের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন। কখন যে বিশ্বাস করা যাবে নিকিকে বলার উপায় নেই।

কিশোরের কাছে। একটা আগাগোড়া চমক। একদিন যেন আকাশ থেকে রকি বীচের মাটিতে খসে পড়েই বোমার মত ফাটল বুউউউম! সৃষ্টি করল এক জটিল রহস্য।

সেই নিকি পাঞ্চ উধাও হয়ে গিয়ে আবার হাজির হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, অর্ধেক সময় ব্যয় করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, পুরানো গাড়ির পার্টস খোঁজে আর মুসাকে শেখায় কি করে ইঞ্জিন ফাইন-টিউন করতে হয়, বাকি অর্ধেক সময় কোথায় থাকে সে-ই জানে।

একটা গ্যারেজের ওপরের ঘরে থাকে নিকি। সপ্তমবার রিং হওয়ার পর ফোন তুলল। যাক, আজ তাড়াতাড়িই ধরল। সাধারণত বারোবারের মাথায় ছাড়া সে ধরে না। ধরেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'আমি, মুসা। একটা জাগুয়ার আনতে যাচ্ছি।'

নিকির মুখে কফি, বরবর আওয়াজ হল, গিলে ফেলল তাড়াতাড়ি। 'জাগুয়ারের তালা খোলা খুব সহজ, কিন্তু চাবি ছাড়া স্টার্ট দেয়া বড় কঠিন।'

'নিকি ভাই, চুরি নয়, কিনে আনতে যাচ্ছি।'

হেসে উঠল নিকি। 'জাগুয়ার কিনবে? আর লজ্জা দিও না। জান কত...?'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'জানি। সত্যিই কিনব। আমার জন্যে না। একটা ফিল্ম কোম্পানি...'

'ও, তাই বলো। যাব।' গাড়ি পছন্দ করতে ভাল লাগে নিকির, খুশি হয়েই রাজি হল।

সকালটা শেষ হওয়ার আগেই এক্সক্লুসিভ কারসের শোরুমে এসে ঢুকল মুসা আর নিকি। দোকানটার আরেকটা ডাকনাম রয়েছে ওখানে, এক্সপেনসিভ কারস, অর্থাৎ অনেক দামি গাড়ি।

হলিউডে ব্রাউন অলিংগারের নাম শুনলেই অনেক বড় বড় দোকানদার গদগদ হয়ে যায়। গাড়ির দোকানদারও তাদের মধ্যে একজন। নতুন গাড়ি, পছন্দ করতে সময় লাগল না। ঘন্টাখানেক বাদেই কালচে সবুজ একটা জাগুয়ার এক্স জে সিক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

রকি বীচে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াল। নিকি ঘুরল গাড়িটার কোথাও কোন গোলমাল আছে কিনা বোঝার জন্যে, আর মুসা ঘুরল ওখানকার পরিচিত মানুষকে দেখানর জন্য যে সে একটা জাগুয়ার চালাচ্ছে। ঘোরার আরও একটা কারণ, বেন ডিলনের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া। ঘরময় ছড়ান ভাঙা কাচ, স্কটিক, আর বোনহেডের রহস্যময় হুঁশিয়ারির ব্যাপারগুলোও ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

'এসব কথা তোমার দুই দোস্তকে না বলে আমাকে বলছ কেন?' নিকি বলল।

'আমি একাই সারতে চাই।'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে নিকি বলল, 'বেশ, দেখো চেষ্টা করে।'

চালিয়ে-টালিয়ে অবশেষে মুসার গুহায় এসে ঢুকল ওরা। 'মুসার গুহা' নামটা দিয়েছে কিশোর। ইয়ার্ডের জঞ্জালের ভেতরে লুকান ট্রেলার যেটাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার, তার পাশেই তৈরি করা হয়েছে মুসার এই ব্যক্তিগত গ্যারেজ। গাড়িটাড়ি সব এখানে এনেই মেরামত করে সে।

'অনেক সময় আছে কাজটা সারার, পুরো দেড় দিন,' মুসা বলল।

'অত সময় লাগবে না,' একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে উইণ্ডশীল্ড-ওয়াশারের ফ্লুইড ট্যাঙ্কটায় টোকা দিয়ে বলল নিকি। 'এটা সরিয়ে প্রথমে আরও বড় একটা লাগাতে হবে।'

লাগাতে বেশিক্ষণ লাগল না। চাপ বাড়ানোর জন্য ছোট একটা এয়ার পাম্পও লাগিয়ে দিল। তারপর, শেষ বিকেলে বাড়িতে ছুটল মুসা, ওর বাবার কাছ থেকে

কিছু কৃত্রিম রক্ত নেয়ার জন্যে। ছবির প্রয়োজনে এই রক্ত রাখতে হয় মিস্টার আমানকে।

রক্ত আনার পর নিকি বলল, 'দেখো লাগিয়ে, কাজ হয় কিনা।'

ওয়াশার বাটন টিপে দিল মুসা। ওয়াশার নজল দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। কিন্তু উইণ্ডশীল্ডে না লেগে লাগল গিয়ে ছাতে।

'হলো না!' বলে উঠল সে। 'গাড়িটার এই অবস্থা দেখলে আমাদের হৃৎপিণ্ড টেনে ছিঁড়বেন রিডার।' হঠাৎ করেই মুসা অনুভব করল আবার তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভারি কিছু চেপে বসছে বুকে। দু'হাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরল সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

'জানি না,' বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মুসা, দম নেয়ার জন্যে। তার মনে হতে লাগল এটা সেই জিন, সাফোকেশনের জিন। স্ফটিকটার কারসাজিও হতে পারে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল ওটা। হাতে আবার গরম লাগল।

'কি ওটা?' জানতে চাইল নিকি।

মুসার পেছন থেকে জবাব এল, 'স্ফটিক। কোয়ার্জ কিংবা টুরম্যালাইন হবে, ভালমত পালিশ করা। এক মাথা চোখা তাই একে বলা হয় সিঙ্গল-টারমিনেটেড ক্রিস্টাল।'

এভাবে কথা কেবল একজনই বলে। ঝট করে ফিরে তাকাল মুসা। কিশোর পাশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে। গায়ে টকটকে লাল টি-শার্ট, বুকের কাছে বড় বড় করে লেখা রয়েছেঃ লাভ টয়, সাম অ্যাসেম্বলি রিকয়ার্ড। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কিন্তু এই জিনিস তোমার কাছে কেন?'

'ইয়ে···একজন···একটা লোক আমাকে দিয়েছে,' আমতা আমতা করে বলল মুসা। 'ছবির লোকেশনে।'

'নিশ্চয় ফারিহার জন্যে উপহার,' রবিন বলল। তার গায়ে একটা বাটন-ডাউন অক্সফোর্ড শার্ট, পরনে চিনোজ আর পায়ে মোকাসিন, মোজা বাদে। এককালের মুখচোরা, রোগাটে রবিন এখন সারা স্কুলে দারুণ জনপ্রিয়। অনেক লম্বা হয়েছে, সুদর্শন, কৈশোর প্রায় শেষ, যুবকই বলা চলে।

'আরে নাহ্,' হাত নাড়ল মুসা। 'ফারিহার জন্যে হতে যাবে কেন?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রবিন, হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠল নিকি, 'আরে সর সর, ওভাবে ঘেঁষে দাঁড়িও না! ক্রোমের চকচকানি নষ্ট করে দেবে তো।'

'আমার ফোক্সওয়াগেনটাকে ফকিরা লাগছে এটার কাছে,' জাগুয়ারটাকে দেখিয়ে রবিন বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'কার এটা?'

'জ্যাক রিডারের। হরর ছবির পরিচালক।'

'আহ্, এরকম একটা জিনিস যদি পেতাম!' পরক্ষণেই ঠোঁট ওল্টাল, 'থাকগে, সবার তো আর সব হয় না। শোন, আইস ক্রিমারিতে যাচ্ছি আমরা। যাবে?'

'নাহ্, সময় নেই,' দুই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিশোর,

অভিনেতাদের ব্যাপারে তো অনেক কিছু জান তুমি। টাইমলি আসা নিয়ে গোলমাল করে?'

'করে মানে?' হেসে উঠল কিশোর। 'যত বড় অভিনেতা, তত বেশি ভোগাবে, অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, এটাই যেন নিয়ম হয়ে গেছে।'

'আরেকটা কথা। ধরো, কোন বাড়িতে প্রচুর কাচ ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অথচ গ্লাস, জানালার কাচ কিংবা ফুলদানী সব ঠিকঠাক রইল। কোত্থেকে আসতে পারে?'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'কিছু না।' চট করে একবার নিকির চোখে চোখে তাকাল মুসা। 'মানে, জরুরী কিছু না। পরে বলব।'

কিশোর আর রবিন চলে গেলে গাড়িটা নিয়ে পড়ল আবার দুই মেকানিক। কয়েক মিনিট পরেই ঝামেলা এসে হাজির। মুসার গার্লফ্রেণ্ড ফারিহা। পরনে নীল জিনস, গায়ে পুরুষের ঢোলা শার্ট। এসেই মুসার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে অপরিচিত মানুষের ভঙ্গিতে বলল, 'শুনুন, আমি ফারিহা গিলবার্ট। আপনি নিশ্চয় মুসা আমান?'

'কি হলো?' মুসা অবাক, 'এরকম করে কথা বলছ কেন?'

'ভুলেই তো যাওয়ার কথা, তাই না? পুরো দুটো দিন দুটো রাত তোমার কোন খোঁজ নেই। চিনতে পেরেছ তাহলে?'

'পারব না কেন? কাজ ছিল।'

'হুঁ। সে তো বুঝতেই পারছি। কিশোর আর রবিনকে যেতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল আইসক্রীম খেতে যাচ্ছে। চলো না, আমরাও যাই?'

'দেখছ না ব্যস্ত?'

'তা তো দেখছি। কিন্তু আমার যে একলা যেতে ভাল লাগে না।' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফারিহা। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ওকে এভাবে খুব সুন্দরী লাগে।

'কি করব বলো? কাজটা সত্যি জরুরী। নইলে আমিও কি আর আইসক্রীম ছাড়ি?'

'তা বটে।' গাড়িটার ওপর দৃষ্টি ঘুরছে ফারিহার। 'কার এটা? এত সুন্দর?'

'সিনেমার লোকের। ছবিতে কাজ করছি তো।'

'তাই নাকি?' গাড়িটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরছে না ফারিহার। 'মুসা, গাড়িটা দাও না, একটা ঘোরান দিয়ে আনি? ইস্, জাগুয়ার চালাতে যা মজা!'

'সরি, অন্যের জিনিস...'

'তাহলে তুমি চলো?'

'আমার সময় নেই বললামই তো।'

'কাল সকালে?'

'ফারিহা, তুমি বুঝতে পারছ না, আমি ব্যস্ত। তাছাড়া একটা কেসের কিনারা করতে...' বলেই থেমে গেল মুসা। লাথি মারতে ইচ্ছে করল নিজেকে, পেটে কথা

রাখতে পারে না বলে।

মুখ বাঁকাল ফারিহা। 'কেস? ছাগল পেয়েছ আমাকে? কেসের কিনারা করছ, অথচ আলাদা হয়ে আছ দুই দোস্তের কাছ থেকে, একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? একা পারবে?'

'কেন পারব না?' রেগে গেল মুসা। 'মাঝে মাঝে সত্যিই রাগিয়ে দাও তুমি...'

ফারিহাও রেগে গেল। 'ওরকম আচরণ করছ কেন আমার সঙ্গে?'

'কি করলাম? তুমিই তো এসেতক টিটকারি দিয়ে চলেছ!'

আরও রেগে গেল ফারিহা। গটমট করে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, 'চললাম! গুড বাই!'

জবাব দিল না মুসা।

গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল ফারিহা।

নিকি বলল, 'মেয়েটাকে অযথা রাগালে।'

'আমি কি করলাম?' হাত ওল্টাল মুসা, 'নিজেই আজেবাজে কথা বলল, রাগল। আসল কথা, নিয়ে বেরোলাম না কেন। আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?'

মাথা চুলকাল নিকি। জবাব দিতে না পেরে হাত নেড়ে বলল, 'বাদ দাও। এসো, কাজটা সেরে ফেলি।'

প্যান্টে হাত ডলে মুছতে গিয়ে পকেটের স্কটিকটা হাতে লাগল মুসার। ডিলনের কথা ভাবল। আবার দম আটকে আসা অনুভূতিটা হলো।

'হ্যাঁ, সেরে ফেলা দরকার,' মুসা বলল। 'শুটিং স্পটে যেতে হবে আবার। তদন্তটা বাকি এখনও।'

যতটা সহজ হবে ভেবেছিল, তত সহজ হলো না কাজটা। পুরোটা রাত খাটাখাটনি করল ওরা, পরদিন সকাল আটটা নাগাদ শেষ হলো কাজ। সেদিন রোববার। শুটিং হবে না, কর্মচারীদের ছুটি। সারাদিন ধরে ফোনে ফারিহার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা, পেল না ওকে। বাড়িতে নেই। আর কোন কাজ না থাকায় বাবাকেই একটা স্পেশাল ইফেক্ট জিনিস তৈরির কাজে সাহায্য করল।

পরদিন সোমবার। স্কুল খোলা। কাজেই স্কুল শেষ করার আগে আর জাগুয়ারটা নিয়ে বেরোতে পারল না।

হলিউডের মুভি স্টুডিওতে সেট সাজিয়েছেন সেদিন জ্যাক রিডার। গেটে মুসাকে আটকাল গার্ড। একবার মাত্র ওয়াশার দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে দিতে হলো উইণ্ডশীল্ডে, আর বাধা দিল না গার্ড। ছেড়ে দিল ওকে।

সাত নম্বর স্টেজে সেট সাজান হয়েছে। কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন রিডার। হাতে কোন কিছুর খোঁচা খেয়েছেন। টিপে ধরে আছেন জায়গাটা।

মুসা ভেবেছিল গাড়িটা দেখলে খুশি হবেন তিনি, কিন্তু তাকালেনই না।

'মিস্টার রিডার,' ডেকে বলল মুসা, 'আপনার গাড়ি...'

'হ্যাঁ, খুব ভাল,' একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রিডার। 'অলিংগারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চাইলে আসতে পারো।'

পিছে পিছে চলল মুসা। আরও কয়েকজন চলল সাথে। রিডারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। দোতলা একটা কাঠের বাড়ির দিকে চলেছে। বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল অন্যেরা, মুসা আর রিডার এগিয়ে চলল।

ব্রাউন অলিংগারের অফিসে এসে ঢুকল ওরা। অনেক বড় একটা ঘর। দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার পোস্টার, স্টিল, আর বিখ্যাত তারকাদের ছবি সাঁটা। মিটিং শুরু হয়ে গেছে।

ওয়ালনাট কাঠে তৈরি বিশাল টেবিলের ওপাশে বসেছেন অলিংগার। আরও পাঁচজন লোক রয়েছে ঘরে। ছবির কাহিনীকার, ডিরেকটর অভ ফটোগ্রাফি, স্টান্ট কোঅরডিনেটর, কসটিউম ডিজাইনার, মেকআপ আর্টিস্ট।

'এসো, এসো,' মুসাকে দেখে বললেন অলিংগার, 'বসো। কেমন আছ? জ্যাক, বসো।' ক্লান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ।

রিডারের পাশে একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল মুসা।

অলিংগার বললেন, 'ডিলন তো মনে হয় ভালমতই ডুব দিয়েছে। কেন যে একাজ করল! কিন্তু আমরা তো আর বসে থাকতে পারি না। তার যখন ইচ্ছে হয়, আসবে। আমরা ইতিমধ্যে দুর্গের কাজগুলো সেরে ফেলতে পারি।'

'ওখানকার সেট সাজাতেই তিন দিন লেগে যাবে,' বলল খাড়া খাড়া কালো চুল এক মহিলা।

হতাশ হয়েই চেয়ারে হেলান দিল মুসা। গাড়ির দৃশ্য গেল! এখন কয়েক হপ্তা আর জাগুয়ারটার দিকে ফিরেও তাকাবেন না রিডার।

'তাতে আর কি?' ঝাঁজাল কণ্ঠে বললেন রিডার। 'এমনিতেই দেরি হবে, আমাদের। নাহয় লাগল আরও তিন দিন।'

সঙ্কেত দিতে আরম্ভ করল অলিংগারের ঘড়ি। মিনিটখানেক পরেই ট্রেতে করে একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে ঢুকল তাঁর সেক্রেটারি। একটা খামের ওপরে 'পার্সোন্যাল' লেখা রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে খুলতে লাগলেন অলিংগার, কান আলোচনার দিকে। পোড়া মাংসের কথায় আসতেই গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, 'সর্বনাশ!'

'কি হলো?' রিডার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভয় লাগছে? অত রক্তপাত সহ্য হচ্ছে না?'

'ওসব না। ডিলন! ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

চার

ঘরে পিনপতন নীরবতা। হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অলিংগার। হাত দিয়ে ডলে সমান করতে লাগলেন অস্বস্তিভরে। ঘরের কারও মুখে কথা নেই।

'কি লিখেছে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল একজন।

'টাকা চায়,' জবাব দিলেন অলিংগার। 'অনেক টাকা। নইলে খুন করবে বেচারা ডিলনকে।'

'কত টাকা?' জানতে চাইলেন রিডার।

'বলেনি। নিজেরাই দেখ।' কাছে বসেছেন লেখক। উঠে নোটটা তাঁর দিকে ঠেলে দিলেন প্রযোজক। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। সব শেষে এল রিডারের হাতে। তিনি সেটা পড়ে মুসাকে না দেখিয়েই আবার ফিরিয়ে দিলেন অলিংগারকে। ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।

ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে! কথাটা ভীষণ চমকে দিয়েছে মুসাকে। যদিও এরকমই একটা কিছু ঘটেছে ভেবে খুঁতখুঁত করছিল তার মন। কি লিখেছে নোটটাতে...

খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ টেনে বের করলেন অলিংগার। 'সর্বনাশ!'

সবাই উঠে হুড়াহুড়ি করে ছুটে গেল দেখার জন্যে। মুসা এক পলকের বেশি দেখতে পারল না, ছবিটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল কালো চুল মহিলা, 'পুলিশকে ফোন করা দরকার।'

ওর হাত চেপে ধরলেন অলিংগার। 'না না! পুলিশকে জানালে খুন করে ফেলবে ওকে! ওগুলো মানুষ নয়, জানোয়ার। নিশ্চয় রসিকতা করেনি!'

রসিকতা যে করেনি তাতে মুসারও সন্দেহ নেই।

'মিস্টার অলিংগার,' বলল সে, 'আমরা কি কিছু করতে পারি? এসব কাজ...'

'না!' মানা করে দিলেন প্রযোজক, 'পুলিশও দরকার নেই, গোয়েন্দাও না!'

'বুঝতে পারছেন কি বলছেন?' রিডার বললেন।

'পারছি। এক গাদা টাকা যাবে আরকি আমার!'

'তা তো যাবেই। আমি বলছি ছবিটার কথা। সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে এখন আমাদের। শ্রমিকদের জানাতে হবে। আমি পারব না! মাথায় বাড়ি মারতে আসবে ওরা! কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকছে এটা জানান প্রযোজকের দায়িত্ব।'

ক্লান্ত দৃষ্টি রিডারের ওপর স্থির হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মাথা ঝাঁকালেন অলিংগার। 'ঠিক আছে, দায়িত্ব যখন, জানাব। চলো, সেটে যাই।'

ডেস্কটার দিকে তাকাল মুসা, যেটাতে নোট আর ছবি রাখা হয়েছে।

প্রথমে এগোলেন অলিংগার, পেছনে রিডার, এবং তার পেছনে অন্যেরা। মুসা ইচ্ছে করে রয়ে গেল পেছনে। সবাই বেরোলেও সে বেরোল না। দরজা লাগিয়ে কয়েক লাফে চলে এল ডেস্কের কাছে। ড্রয়ার খুলে নোটটা বের করল।

খবরের কাগজের অক্ষর কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে লিখেছেঃ আমরা বেন ডিলনকে নিয়ে গেছি। ফেরত চাইলে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। পুলিশকে জানালে তাকে আর জ্যান্ত দেখার আশা নেই। পরবর্তী নির্দেশ আসছে।

ছবিটা দেখল মুসা। ধাতব একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসিয়ে তোলা হয়েছে। হাত মুচড়ে পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধা হয়েছে। মুখে চওড়া সাদা টেপ লাগান। পা বাঁধা হয়েছে গোড়ালির কাছে। ডিলনের বিখ্যাত নীল চোখজোড়ায় আতংক, যেন সামনে মূর্তিমান মৃত্যু দাঁড়ানো।

দেরি করল না মুসা। নোট আর ছবিটা পকেটে নিয়ে রওনা হলো হলের দিকে, সেখানে ফটোকপি মেশিন আছে, আসার সময় লক্ষ্য করেছিল। কপি করে রাখবে দুটোরই।

নোট এবং ছবিটার কয়েকটা করে কপি করে অলিংগারের অফিসে ফিরে এল আবার। সেক্রেটারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৈফিয়ত দিল, 'একটা জিনিস ফেলে এসেছি।' মেয়েটা বিশ্বাস করল, মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে যেতে দিল, নিজে সঙ্গে এল না। আগের জায়গায় জিনিসগুলো রেখে দিল মুসা।

এবার কি? শুধুই রহস্য নয় আর এখন, অপহরণ কেস, একজনের জীবন মরণ সমস্যা। কাজটা একা করার যতই আগ্রহ থাকুক, ঝুঁকি নেয়াটা আর ঠিক হবে না কোনমতেই। একটাই করণীয় আছে এখন, এবং সেটাই করল সে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'কিশোর? মুসা। কোথাও যেও না। থাক। জরুরী কথা আছে। আমি আসছি।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই দরজা খুলে গেল।

মুসার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অলিংগারের সেক্রেটারি। চোখে সন্দেহ। 'কি করছ?'

'জরুরী একটা ফোন। সরি।' পকেট থেকে জাগুয়ারের চাবির গোছাটা বের করে ডেস্কে রাখা একটা বাক্সে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোল মুসা। সেক্রেটারির দিকে তাকাল না আর।

গাড়ি নেই। সিনেমার একজন কর্মীর গাড়িতে লিফট নিয়ে রকি বীচে এল সে। বাড়িতে পৌঁছে নিজের গাড়িটা বের করে নিয়ে চলে এল ইয়ার্ডে। গাড়ি থেকে নেমে ওঅর্কশপের দিকে ছুটল। দরজায় হাত দেয়ার আগেই কিশোরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'মুসা, সবুজ টি-শার্ট, নীল জিনস, আর বাস্কেটবল শু পরেছ।'

'কি করে জানলে?'

ট্রেলারের দরজা খুলে দিয়ে রবিন বলল, 'ওপরে দেখো।'

ছাতে বসান হয়েছে একটা ভিডিও ক্যামেরা। পুরানো টেলিস্কোপ সর্বদর্শনটা যেখানে ছিল সেখানে। এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশের সব কিছু দেখে চলেছে। ক্যামেরার চোখ। এটা কিশোরের নতুন সিকিউরিটি সিসটেম। এটার নামও সর্বদর্শনই রাখা হয়েছে। পুরানো পদ্ধতি সরে গিয়ে নতুনকে ঠাঁই করে দিয়েছে জিনিসটা, কিশোরের সামনে ডেস্কে রাখা আছে মনিটর।

'খুব ভাল করেছ,' হেডকোয়ার্টারে ঢুকে বলল মুসা। 'শোন, যে জন্যে থাকতে বলেছিলাম। খবর আছে। বেন ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে তার মালিবু বীচের বাড়ি থেকে। একটু আগে সাফোকেশন টু ছবির পরিচালক অলিংগারের সঙ্গে মিটিঙে বসেছিলাম। তখনই এল র‍্যানসম নোট।'

'সময় নষ্ট না করে ভাল করেছ,' কিশোর বলল। 'খুলে বলো।'

রঙিন মনিটরটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের ওপরই উঠে বসল মুসা। জিনসে হাত ডলছে, অস্বস্তিতে। 'ইয়ে···সব কথা তোমাদের ভাল লাগবে না। রেগে যাবে আমার ওপর। আসলে, সময় অনেকই নষ্ট করেছি। কারণ···'

'আরে দূর!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন, 'অত ভণিতা করছ কেন? বলে ফেলো না।'

'ডিলন সম্ভবত তিন দিন আগে কিডন্যাপ হয়েছে।'

'তিন দিন আগে হয়েছে,' কিশোর বলল, 'আর তুমি জেনেছ খানিক আগে?'

'ঠিক তা নয়। আমি তিন দিন আগেই সন্দেহ করেছি,' মুসা বলল। দেখল, কিশোরের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আস্তে আস্তে গোল হয়ে যাচ্ছে। 'প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদেরকে জানাবই না। একা একাই কেসটার সমাধান করে তাক লাগিয়ে দেব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি; আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে আমার।'

ঠোঁট দিয়ে ফুট ফুট শব্দ করল কিশোর। শ্রাগ করে বলল, 'তাতে আমি মাইণ্ড করিনি। বরং আগেই কিছু তদন্ত সেরে ফেলে ভাল করেছ।'

মুখ তুলে তাকাতে পারল না মুসা। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'মাইণ্ড করবে, এখুনি। আমি ব্রাউন অলিংগারকে বলেছি তিন গোয়েন্দার হেড হলাম আমি। আর তোমরা দু'জন আমার সহকারী। তোমাদেরকে ডাকব কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

হো হো করে হেসে উঠল রবিন। 'নতুন কার্ডে গোয়েন্দা প্রধান কে লেখা নেই বলেই সুযোগটা নিতে পেরেছ।'

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'র‍্যানসম নোটটা দেখেছ?'

'কপি করেই নিয়ে এসেছি।' পকেট থেকে নোট আর ছবির কপি বের করে দিল মুসা।

ছবিটা দেখে আফসোস করে বলল রবিন, 'আহারে, বেচারার বড়ই কষ্ট।'

'ডিলনের কষ্টের কথা বলছ?' কিশোর বলল, 'অযথা দুঃখ পাচ্ছ। ভাল করে দেখ, বুঝতে পারবে। যতটা সম্ভব খারাপ অবস্থা দেখানর ইচ্ছেতেই এরকম ভঙ্গিতে রেখে তোলা হয়েছে এই ছবি। হাতটা কতটা পেছনে নিয়ে গেছে দেখ। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বেহুঁশ হয়ে যেতে বাধ্য। ওকাজ কিছুতেই করতে যাবে না কিডন্যাপাররা। যদি সত্যিই ডিলন ওদের কাছে দামি হয়ে থাকে।'

'আরেকটা ইনটারেসটিং ব্যাপার,' নোটটা দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'খবরের কাগজ থেকেই কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস কিংবা হেরাল্ড এক্জামিনার থেকে নয়। অন্য কোন কাগজ। অক্ষর দেখলেই আন্দাজ করা যায়।'

'তোমার ধারণা,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে কোথাও থেকে পাঠানো হয়েছে নোটটা?'

'সূত্র তো তাই বলে,' জবাব দিল কিশোর।

এক এক করে রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। স্বীকার করল, 'আসলেই আমি গোয়েন্দাপ্রধান হওয়ার অনুপযুক্ত। বার বার দেখেছি এগুলো, অথচ কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'পারতে,' কিশোর বলল, 'তুমিও পারতে, মাথা ঠাণ্ডা করে দেখলে। যাকগে। আর কিছু?'

'অদ্ভুত আরও কতগুলো ঘটনা ঘটেছে।' শুটিং স্পটে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল মুসা। প্রথম সাফোকেশন ছবির শুটিঙের সময় যেসব গোলমাল হয়েছে শুনেছে, সেসবও বাদ দিল না। সব শেষে বলল পটার বোনহেডের দেয়া স্ফটিকটার কথা। বলল, 'আমাকে সাবধান করে দিয়েছে সে। তৃতীয় নয়নের মাধ্যমে নাকি দেখতে পেয়েছে আমার বিপদ। বলেছে, স্ফটিকের নির্দেশ আমার শোনা উচিত।'

'শোনা শুরু করলেই বরং বিপদে পড়বে,' কিশোর বলল, 'মানসিক ভারসাম্য হারাবে।'

কথা বলতে বলতে কখন যে রাত হয়ে গেল টেরই পেল না ওরা। আচমকা বলে উঠল মুসা, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসে ওর ভেপাতে উঠল তিনজনে। অন্ধকার রাত। এতক্ষণ ভূত-প্রেত, ডাইনী নিয়ে আলোচনা করে এখন সর্বত্রই ওসব দেখতে লাগল। ডাইনী, ভূত, কঙ্কাল...

'অ্যাই, ভুলেই গিয়েছিলাম,' মুসা বলল, 'আজকে হ্যালোউইন উৎসব।'

কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল ওরা। স্কুলের কোন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিনা দেখল। দেখা গেল অনেককেই, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আছে। নানারকম সাজে সেজেছে ওরা। সাফোকেশন ছবির জোম্বি আর ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগুলোর কথাই মনে করিয়ে দিল মুসার।

একটা পিজা শ্যাকে ঢুকে পিজা খেয়ে নিয়ে আবার বেরোল ওরা। একটা স্টপ সাইনের কাছে এসে ব্রেক করল মুসা। চালু করে দিল উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার। এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল ওয়াইপার আর কাচে লাগতে শুরু করল ঘন রক্ত।

'এটা কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অবিশ্বাস্য!' রবিন বলল, 'ওই জাগুয়ারটার মত তোমার গাড়িতেও এই কাণ্ড করেছ?'

হাসল মুসা। গাড়িটা ঘুরিয়ে কাচটা এমন ভঙ্গিতে রাখল, যাতে রাস্তায় চলমান গাড়ির আলো এসে পড়ে আর চালকদের চোখে পড়ে সেই রক্ত। চমকে যেতে লাগল লোকে।

বহু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একসময় হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ওরা।

'দেখো দেখো!' চিৎকার করে বলল রবিন, 'ট্রেলারের দরজার অবস্থা!'

'শুধু দরজাই না,' সতর্ক হয়ে উঠেছে কিশোর, 'জানালাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে!'

'তখনই বলেছিলাম, ট্রেলারটাকে জঞ্জালের নিচ থেকে বের করার দরকার নেই,' মুসা বলল, 'এখন হলো তো! ঢুকল কি করে ব্যাটারা?'

'গেট বন্ধ হওয়ার আগেই হয়ত ঢুকে বসেছিল,' অনুমান করল রবিন।

গাড়ি থেকে নেমে ট্রেলারের দিকে দৌড় দিল তিনজনে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মেঝেতে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে তিন গোয়েন্দার ফাইলপত্র। ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ।

'ব্যাটারা এখানে কিছু খুঁজতে এসেছিল!' রবিনের কণ্ঠে চাপা রাগ।

মুসার মনে হতে লাগল, দেয়ালটা বুঝি তার দিকে এগিয়ে আসছে। গুঙিয়ে উঠল সে।

'কি হলো, মুসা?'

'দম আটকে আসছে আমার! শ্বাস নিতে পারছি না!'

দেয়ালে টেপ দিয়ে লাগান রয়েছে মেসেজ। খবরের কাগজের অক্ষর কেটে সেই একই ভাবে লিখেছে, অলিংগারের কাছে যেভাবে নোট পাঠান হয়েছিল। এগিয়ে গেল কিশোর। পড়ে দুই সহকারীর দিকে ফিরে বলল, 'ডিলনের ব্যাপারেই লিখেছে!'

এগিয়ে এল রবিন আর মুসা। ওরাও পড়ল মেসেজটাঃ

'বেন ডিলনের রক্তপাতের জন্যে তোমরা দায়ী হবে!'

পাঁচ

'শ্বাস নিতে পারছি না!' গলায় হাত দিয়ে ঢোক গিলতে লাগল মুসা। 'দম আটকে যাচ্ছে আমার! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!'

'সব তোমার কল্পনা,' দ্রুত গিয়ে ট্রেলারের দরজার পাল্লা হাঁ করে খুলে দিল কিশোর অক্টোবর রাতের তাজা বাতাস ঢোকার জন্যে। আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে বুমম করে ফাটল দুটো বাজি।

'এগুলো সাফ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে!' গুঙিয়ে উঠে ছড়ানো জিনিসপত্রগুলো দেখাল রবিন।

'তা না হয় করলাম,' কিশোর বলল। 'সেটা নিয়ে ভাবি না। ভাবছি আমাদের সমস্ত গোপন ফাইল দেখে গেল ব্যাটারা!'

'আসলে,' রবিন বলল, 'এই হেডকোয়ার্টারে আর চলবে না আমাদের। বহু বছর তো কাটালাম পুরানো জায়গায়। এভাবে আর চলবে না। নতুন জায়গায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাতে হবে আমাদের, চোর-ডাকাত ঠেকানর ব্যবস্থা রাখতে হবে...'

হাঁসফাঁস করতে করতে মুসা বলল, 'কিছুই করতে হত না! ট্রেলারটা যেমন লুকান ছিল তেমনি থাকলেই ভাল হত! এত বছর তো আরামেই ছিলাম...'

'ছিলাম,' রবিন বলল, 'আমাদের বয়েস কম ছিল, সেটা একটা কারণ। তেমন মাথা ঘামাত না কেউ। ভাবত, ছেলেমানুষের খেয়াল। এখন আর আমাদেরকে দেখলে সেটা মনে করে না কেউ। সিরিয়াসলি নেয়। বড় হওয়ার এই এক যন্ত্রণা...'

'ব্যাটারা জানল কি করে এই কেসে কাজ করছি আমরা?'

চুপ করে ভাবছে কিশোর। জবাব দিল, 'নিশ্চয় কিডন্যাপাররা ছবিটার সঙ্গে জড়িত সবার ওপর নজর রেখেছে। তুমিও বাদ যাওনি।'

পুরানো একটা ধাতব ফাইল কেবিনেট তুলে সোজা করে রাখতে কিশোরকে

সাহায্য করল মুসা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না! র‍্যানসম নোটটা আজকেই এল। ভাবতেই পারিনি, আমাকেও ফলো করতে আরম্ভ করবে।'

'ঘরটাকে আগে গুছিয়ে ফেলি,' কিশোর বলল। 'তারপর ভালমত আলোচনা করতে বসব কার চোখ পড়ল আমাদের ওপর।'

'শুধু আলোচনায় তো কাজ হবে না,' রবিন বলল, 'ওদেরকে বের করতে হবে। কি করে করবে?'

'পরে ভাবব। এখন জরুরী, ভিডিও সিকিউরিটি সিসটেমটা দেখা।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'ক্যামেরা! লোকগুলোর ছবি নিশ্চয় উঠে গেছে ভিডিও টেপে!'

'তাহলে তো কাজই হবে,' রবিন বলল। 'কিন্তু টেপ কি অতটা লম্বা ছিল? ওরা যখন এসেছে তখনও রেকর্ড করছিল?'

'দেখাই যাক না।' টেপ রিউইণ্ড করার বোতাম টিপে দিল কিশোর। দুই সহকারীকে জানাল, 'সারাক্ষণ চলার মত করে সিসটেমটা তৈরি করিনি। ওই পদ্ধতি ভাল না। অন্য ব্যবস্থা করেছি। বাইরে একটা ইলেকট্রিক আই লাগিয়েছি। হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি কেউ এলে চোখে পড়ে যাবে যন্ত্রটার, চালু হয়ে যাবে ভিডিও রেকর্ডার। লোকটা চলে গেলেই অফ হয়ে যাবে ক্যামকর্ডার। আবার কেউ এলে আবার চালু হয়ে যাবে...'

প্লে বাটন টিপে দিল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন জোড়া চোখ। ছবি ফুটতেই আরও ভাল করে দেখার জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ওরা। ছবি দেখে ছিটকে পেছনে সরে গেল আবার।

লম্বা, পাতলা একটা মূর্তি ঝিলমিল করতে করতে বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে, ভরে দিল পর্দা। ট্রেলারের দিকে এগিয়ে আসছে যেন ভেসে ভেসে, হেঁটে নয়। লম্বা কালো আলখেল্লার কোণ ধরে টানছে বাতাস, বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

পঅজ বাটনটা টিপে দিল কিশোর। স্থির হয়ে গেল মূর্তি। ভয়াবহ মুখটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সে।

মুখের রঙ ফসফরাসের মত সবুজ, তেমন করেই জ্বলে। লাল চোখ। গলার কাছে কালো গর্ত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন অস্থির, দেহের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসতে চাইছে, সেই ব্যথারই ছাপ পড়েছে মুখে।

'খাইছে!' নিচু গলায় বলল মুসা। জোরে বলার সাহস হারিয়েছে।

পঅজ রিলিজ করে দিল কিশোর। পেছনে, আশেপাশে তাকাতে লাগল মূর্তিটা। কয়েকবার করে তাকিয়ে যখন নিশ্চিত হল তাকে কেউ লক্ষ করছে না, তখন একটা পা তুলে জোরে এক লাথি মারল ট্রেলারের দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল লোকটা। ক্যামেরার চোখ থেকে সরে যাওয়ায় দেখা গেল না তাকে। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে আলখেল্লার কোণ উড়িয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'মানুষ তো?' মুসার প্রশ্ন।

কয়েকবার করে টেপটা চালিয়ে দেখল ওরা। প্রতিবারেই নতুন কিছু না কিছু চোখে পড়ল।

'ব্যাটার শ্বদন্ত আছে,' রবিন বলল।

'ডান হাতের আঙুলে একটা আঙটি,' বলল কিশোর। 'বড় একটা পাথর বসান।'

অদ্ভুত মূর্তিটার সব কিছুই যখন দেখা হয়ে গেল, আর কিছুই বাকি রইল না, যন্ত্রটা অফ করে দিল কিশোর।

'চালাকিটা ভালই করেছে,' মুসা মন্তব্য করল। 'হ্যালোউইনের রাতে ভ্যাম্পায়ারের সাজ সেজে এসেছে, কেউই লক্ষ্য করবে না ব্যাপারটা। আজকের রাতে ওরকম ছদ্মবেশ পরে খুন করেও পার পাওয়া যাবে, ধরা পড়তে হবে না।'

'এবার একটা প্ল্যান করা দরকার,' কিশোর বলল। 'মুসা, কাল আমাদেরকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে তুমি। লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখব, ডিলনকে কে বেশি চেনে। শেষ কে দেখেছিল, জানব। বোঝার চেষ্টা করব, কার কার নাম সন্দেহের তালিকায় ফেলতে হবে।'

পরদিন স্কুল শেষ করে স্টুডিওতে গিয়ে প্রথম যে মানুষটার সামনে পড়ল তিন গোয়েন্দা, তিনি মুসার বাবা রাফাত আমান। ভয়ঙ্কর একটা মুখোশ পরে স্টুডিও লট ধরে হেঁটে চলেছেন।

'তোমরা? একেবারে সময়মত এসেছ,' আমান বললেন। 'আমার ইফেক্টগুলো কেমন আসবে, দেখতে যাচ্ছি। দেখার ইচ্ছে আছে? ডেইলি।'

না বলার কোনই কারণ নেই। আমানের পিছু পিছু একটা প্রাইভেট স্ক্রিনিং রুমের দিকে চলল ওরা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ডেইলিটা কি? দৈনিক কোন ব্যাপার না তো?'

'তা-ই। শুটিং করা প্রতিদিনকার অংশকে ডেইলি বলে ফিল্মের লোকেরা,' বাবার হয়ে জবাবটা দিল মুসা। দিয়ে গর্বিত হলো, রবিনের চেয়ে এ ব্যাপারে বেশি জানে বলে। 'এডিট করা হয় না তখনও, প্রচুর ভুলভাল থেকে যায়।'

স্ক্রিনিং রুমটাকে খুদে একটা সিনেমা হলই বলা চলে। ছয় সারি সীট। লাল মখমলে মোড়া গদি। সামনের সারির প্রতিটি সীটের ডান হাতলে রয়েছে ইনটারকমের বোতাম। ওখানকার একটা সীটে বসে বোতাম টিপে দিলেন আমান। প্রেজেক্শনিস্টকে ছবি চালাতে বললেন।

হলের আলো কমিয়ে দিয়ে ছবি চালানো হলো।

আগের হপ্তায় তোলা স্পেশাল ইফেক্টের ছবিগুলো দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। প্রতিটি দৃশ্যেই জ্যাক রিডারের ছাপ স্পষ্ট, ভয়ঙ্কর বীভৎস করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

একটা দৃশ্যে একটা বাচ্চা ছেলে বার বার হেঁচকি তুলছে।

'কি করে সারাতে হয় জানি আমি,' বলল বাচ্চাটার মা, স্বাভাবিক মানুষ নেই আর, জোম্বি হয়ে গেছে। 'ভয় দেখাতে হবে। আর কোন উপায় নেই।'

বলেই একটানে বাচ্চাটার একটা হাত ছিঁড়ে ফেলল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। কাঁধের কাছের ছেঁড়া জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

'দেখলে তো? হেঁচকি বন্ধ।'

'কাট!' শোনা গেল রিডারের কণ্ঠ, ক্যামেরার চোখের বাইরে থেকে। 'আর কবে শিখবে? কিছুই তো বলতে পারো না।'

আরেকটা দৃশ্যে নাকে রুমাল চেপে হাঁচি দিল একটা লোক। তারপর আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল রুমালের দিকে, হাঁচির চোটে তার নিজের মগজই নাক দিয়ে বেরিয়ে এসে রুমালে লেগে গেছে।

রবিনের দিকে কাত হয়ে তার কানে কানে কিশোর বলল, 'জ্যাক রিডার একটা চরিত্র বটে!'

'স্যাডিস্ট!' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন।

তারপর বেন ডিলনের অভিনীত কয়েকটা দৃশ্য চলল। সে নিজেই জোম্বিতে পরিণত হল, চোখের কোণে কালো দাগ পড়ল। রঙ দিয়ে করা হয়েছে ওগুলো।

'বাবা,' পর্দায় বলছে ডিলন, 'তুমি আমাকে হার্ভার্ডে পাঠাতে চাও তো। যেতে ইচ্ছে করে না। আমার ভাল লাগে লোকের গলা কামড়ে ছিঁড়ে মাথা আলাদা করতে।'

'স্ক্রিপ্ট লিখেছে কে?' জোরে জোরেই বলল মুসা, 'মাথায় খালি কুৎসিত চিন্তা...'

'চুপ,' থামিয়ে দিলেন ওকে আমান। 'আমার চাকরিটা খাবে নাকি?'

নতুন আরেকটা দৃশ্যে দেখা গেল ডিলন আর একজন সুন্দরী অভিনেত্রীকে। মেয়েটা খাট, কোঁকড়া কালো চুল, চোখের পাপড়িও কোঁকড়া।

'অ্যাঞ্জেলা ডোভার না?' সামনে ঝুঁকে আমানকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। এই ছবির সহ-অভিনেত্রী। তবে অনেক দেখান হয় ওকে, চরুতেই টানা বিশ মিনিট। ডেটিং করে ডিলনের সঙ্গে। এই দৃশ্যে দেখান হবে নিরীহ, গোবেচারা, ভালমানুষ, কিছুটা বোকাও। ভাবতেই পারেনি ওপরতলা থেকে দুটো মানুষের বাচ্চাকে খেয়ে এসেছে ডিলন।'

'বিশ্বাস কর, ডানা,' ডিলন বলছে, 'কেমন জানি হয়ে গেছি আমি। অদ্ভুত অনুভূতি। দম নিতে কষ্ট হয়। মনে হয়, কবরে শুয়ে আছি, বেলচা দিয়ে মাটি ছিটান হচ্ছে আমার ওপর, ঢেকে দেয়ার জন্যে। মনে হয়, একের পর এক মানুষ খুন করি।'

'বেন,' ডিলনের বাহুতে থেকে বলল ডানা, 'ওসব কিছু না। শুধুই কল্পনা। একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই তোমার।'

'কাট!' চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার, 'অ্যাঞ্জেলা, ওকে বেন বলছ কেন?'

'শিওর, এ ছবি থ্যাঙ্কসগিভিঙের দিনে মুক্তি দেয়া হবে,' রবিন বলল।

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'তখন খেতে ব্যস্ত থাকবে সবাই। এই ঘোড়ার ডিমের দিকে নজর থাকবে না। এ একটা দেখার জিনিস হলো!'

হাসতে শুরু করল কিশোর আর মুসা।

'এতই খারাপ?' জিজ্ঞেস করলেন আমান।

রবিন আর মুসা চুপ করে রইল। ভাবছে, জবাবটা কিশোরই দিক। কিশোরের বুদ্ধি বেশি, সিনেমার ব্যাপারে জ্ঞান বেশি, ঠিক জবাব সে-ই দিতে পারবে।

'স্ক্রিপ্টের কোন হাতামাথা নেই, ডিরেক্টরের হয়ে আছে মাথা গরম,' কিশোর বলল। 'রিডারের মত কম দামি পরিচালক বেশি বাজেটের ছবিতে হাত দিতে গেলে হবেই এরকম। মাথা গরম হয়ে গেছে লোকটার। মণ্ডো গ্রসোই এখনও মাথা থেকে নামেনি। ওই একই কাণ্ড করছে। আঙ্কেল, আপনি সত্যি কথাটা শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।'

'ভাবনায় ফেলে দিলে আমাকে তুমি, কিশোর,' আমান বললেন। কিশোর বুঝল, ভাবনায় তিনি আগেই পড়েছেন, তার সঙ্গে আলোচনা করে নিজের ধারণাগুলো মিলিয়ে দেখলেন আরকি।

সবগুলো ডেইলি দেখার পর উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে ডিলন অপহরণ কেসের সূত্র খোঁজার ইচ্ছে। আটকালেন ওদেরকে আমান।

'আজ সকালে ব্রাউন অলিংগার ফোন করেছিলেন,' বললেন তিনি। 'তিনি ভয় পাচ্ছেন, তোমরা তদন্ত করতে গিয়ে ডিলনের বিপদ বাড়িয়ে দেবে।'

'বাবা...'

'জানি, তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা,' আমান বললেন বাধা দিয়ে, 'আমার চেয়ে তো আর বেশি জানে না কেউ। কিন্তু অলিংগার কিডন্যাপারদের নির্দেশ মেনে চলতে চান। তিনি বলেছেন টাকা গেলে তাঁর যাবে, বাইরের কেউ, মানে তোমরা যাতে এতে নাক না গলাও। তোমাদেরকে চলে যেতে বলছি আমি। সরি।'

কোন প্রতিবাদেই আর কাজ হবে না। রাজি করাতে পারবে না ওরা রাফাত আমানকে। অলিংগারের ওপরই রাগ হতে লাগল ওদের। গটমট করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে রওনা হল মুসার গাড়িতে করে। সমস্ত লস অ্যাঞ্জেলেসে লাল আলো লেপ্টে দিয়েছে যেন অস্তমিত সূর্য। অন্ধকারের দেরি নেই।

ড্রাইভিং হুইলে বসেছে মুসা, রবিন তার পাশে, হাতে রেডিও, আর পেছনের সিটে বসে বকবক করে বলে যাচ্ছে কিশোর, জ্যাক রিডার কি কি ভুল করেছেন।

হঠাৎ করেই বলল, 'অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে ডিলনের অভিনয় তাঁকে জেলাস করে তুলেছে।'

'নাকি তুমিই জেলাস হয়ে গেছ?' রসিকতা করল রবিন, 'সেজন্যেই রিডারকে দোষ দিচ্ছ।'

রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর। 'মেয়েটার চোখে ভয়াবহ আলো ফেলে শুটিঙের ব্যবস্থা করেছেন পরিচালক, ভুল অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা হয়েছে।'

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি রাখল মুসা। রেডিওর ডায়াল ঘোরাচ্ছিল রবিন, জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'খিদে পেয়েছে,' বলল মুসা। 'চলো, কিছু খাই।'

রবিন বলল, 'আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মা বাইরে যাবে। চলো, বাড়ি গিয়েই খাব।'

আধ ঘণ্টা পর রবিনদের বাড়িতে এসে রান্নাঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর খাবার রয়েছে টেবিলে। সেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।

পেট কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে পকেট থেকে র‍্যানসম নোটের কপিটা বের করে টেবিলে রাখল কিশোর।

সেটা দেখে রবিন বলল, 'কি মনে হয় তোমার? পরবর্তী নির্দেশ কি পাঠিয়েছে মিস্টার অলিংগারের কাছে?'

ঠিক এই সময় রান্নাঘরে ঢুকলেন রবিনের বাবা। ওদেরকে দেখে হাত নেড়ে বললেন, 'খাও তোমরা। আমি শুধু কফি খাব।' কাপ নিতে গিয়ে নোটটার ওপর চোখ পড়ল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি?'

'একটা কেসের তদন্ত করছি আমরা, বাবা,' রবিন বলল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে নোটটা দেখতে লাগলেন মিলফোর্ড। হঠাৎ বললেন, 'রবিন, ডেইলি ভ্যারাইটি থেকে কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, বুঝতে পেরেছ?'

'আপনি শিওর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চয়ই।'

কফি শেষ করে উঠে চলে গেলেন মিলফোর্ড।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

শান্ত কণ্ঠে আনমনেই বলতে লাগল একসময়, 'এর মানে জান তো? বেন ডিলনকে যে কিডন্যাপ করেছে সে ফিল্মের সঙ্গে জড়িত। সাফোকেশন টু-র কর্মচারী হলেও অবাক হব না।'

ছয়

পুরো একটা মিনিট চুপ হয়ে রইল তিনজনেই। তাকিয়ে রয়েছে র‍্যানসম নোটটার দিকে। যেন ওটাতেই রয়েছে সমস্ত রহস্যের জবাব।

কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন অবশেষে রবিন বলল, 'কর্মীদের কেউ বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করেছে?'

'কিংবা কোন অভিনেতা,' বলল কিশোর। 'সিনেমার লোক, এ ব্যাপারে আমি শিওর। সাধারণ চোরডাকাতে ভ্যারাইটি পড়ে না। বেশি পড়ে সিনেমার লোকে। তাদের কাছে ওটা বাইবেল। খুব জরুরী সূত্র এটা। বড় একটা ধাপ এগোলাম।'

'তার মানে,' মুসা বলল, 'এমন একজন লোক দরকার, যার ওপর সন্দেহ হয়, যার মোটিভ আছে। আর দরকার জানা, কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ডিলনকে।'

'আস্তে, আস্তে,' কিশোর বলল, 'তাড়াহুড়া করলে ভুল হয়ে যাবে। শান্ত হয়ে মাথা খাটিয়ে একেকটা প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে। তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

সাফোকেশন টু-র শ্রমিক কর্মী অভিনেতা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। জানতে হবে কে ডিলনের শত্রু, কে মিত্র। আমি অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে দিয়ে শুরু করতে চাই।'

'করো।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, 'কিন্তু আগে ওকে কেন?'

'ডিলন নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তার সঙ্গে অভিনয় করেছে সে। আরও একটা ব্যাপার আছে। মুসার বাবা বললেন ওদের মাঝে মন দেয়ানেয়ার ব্যাপার থাকতে পারে।'

'পারে?'

'হ্যাঁ। তিনি শিওর নন।'

'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, কিশোর,' মুসা বলল। 'অ্যাঞ্জেলা ডোভার বড়ই মুখচোরা স্বভাবের, বাবা একথাও বলেছে। সহজে কথা বলতে চায় না। ছদ্মবেশে থাকতে পছন্দ করে। এমন ভাবে থাকে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। ফিল্ম স্টারদেরকে লোকে জ্বালাতন করে তো, বেরোতে পারে না ঠিকমত...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'ছদ্মবেশ, না? ভাবছি, হ্যালোউইনের রাতে কোথায় ছিল সে?'

পরদিন বিকেলের আগে সময় করতে পারল না মুসা। কমলা ভেগাটা চালিয়ে নিয়ে এল পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। হর্ন বাজাতে বাজাতে ডাকল, 'এই কিশোর! বেরোও! ওকে পেয়েছি!'

ইলেকট্রনিক ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'এসো, গাড়িতে ওঠ। এইমাত্র একটা গরম খবর শোনাল বাবা।' অ্যানহেইমের বাড়িতে গিয়ে ডুব দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা ডোভার, পরের ছবিটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্যে।'

'অ্যাঞ্জেলা ডোভার? দাঁড়াও, এখনি আসছি!' বাড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেল কিশোর। দশ মিনিট পরেই ফিরে এল পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। নতুন জিনসের প্যান্ট, ইস্ত্রি করা অক্সফোর্ড ড্রেস শার্ট। 'চল। রবিনদের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'ও আসতে পারবে না। ট্যালেন্ট এজেন্সিতে জরুরী কাজ আছে, খবর পাঠিয়েছেন বার্টলেট লজ। সেখানে চলে গেছে।'

'হুঁ!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'মাঝে মাঝে মনে হয়, তিন গোয়েন্দা আর নেই আমরা, দুই গোয়েন্দা হয়ে গেছি! ওর এই ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা বাদ দিতে পারলে ভাল হত!'

'ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে।' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। 'না দিলে নেই। আমরা দু'জনেই চালাব। ও তো আজকাল আর তেমন সাহায্য করতে পারে না আমাদেরকে।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল, 'সবাইকেই একসময় একলা হয়ে যেতে হয়। সব

সময় তো আর সবাই একসঙ্গে থাকতে পারে না। এমনও হতে পারে, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তুমিও চলে যাবে। তখন একলা চলতে হবে না আমাকে? গোয়েন্দাগিরি তো ছাড়তে পারব না কোনদিনই।' আনমনা হয়ে গেল সে। 'ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন না, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে...' বেসুরো গলায় গুনগুন করে গাইতে লাগল সে।

পুরো একটা ঘন্টা চালানর পর একটা তিনতলা বাড়ির সামনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। একটা রিটায়ারমেন্ট কমপ্লেক্স। সাইনবোর্ড লেখা রয়েছেঃ সিলভান উডস রেস্ট হোম। কিশোর বলল, 'সব ফাঁকিবাজি, মিথ্যে বিজ্ঞাপন। উডস মানে তো বন, এখানে বন কোথায়? সিলভানই বা কই? ওরকম বনদেবতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। একটা ফ্রিওয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছি।'

'বন দেখতে তো আর আসিনি আমরা,' মুসা বলল, 'নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে পেলেই হলো।' তাকিয়ে রয়েছে কিছু লোকের দিকে, সবাই বৃদ্ধ, চুল সাদা হয়ে গেছে। 'এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা কঠিন হবে ওর জন্যে।'

'মনে হয়।'

খুঁজতে লাগল ওরা। গেম রুম, টিভি রুম, কার্ড রুম, সব জায়গায় উঁকি দিল। হোমের বয়স্ক বাসিন্দারা হয় চেয়ারে বসে খেলছে, কথা বলছে, নয়ত ছড়ি হাতে হাঁটাচলা করছে শরীরটাকে আরও কিছুদিন সচল রাখার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। যতই বুড়ো হোক, মরতে তো আর চায় না কেউ। মহিলারা কেউ সেলাইয়ের কাজ করছে, কেউ বই পড়ছে, দু'একজন গিয়ে ফুল গাছের যত্ন করছে বাগানে। কিশোর আর মুসাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না। অন্তত শুরুতে বলতে চাইল না।

তারপর ডাক দিল একজন, 'এই ছেলেরা, শোনো।'

ঘুরে তাকাল দু'জনে। বড় একটা পাম গাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে আছে এক বৃদ্ধা। ধূসর চুল ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক হ্যাটের নিচে। আঙুল বাঁকা করে ওদেরকে কাছে যেতে ইশারা করছে মহিলা। কোলের ওপর ফেলে রেখেছে হালকা একটা কম্বল, পা ঢেকে রেখেছে।

এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

বেঞ্চে চাপড় দিয়ে ওদেরকে পাশে বসতে ইশারা করল মহিলা। মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। হাসলে সেগুলো আরও বেশি কুঁচকে গভীর হয়ে যায়। বলল, 'আমার নাম পলি। কাউকে খুঁজছ মনে হয়?'

'একজন মহিলাকে খুঁজছি,' কিশোর বলল।

'আমিও তো মহিলা,' হেসে বলল পলি। দ্রুত ওঠানামা করল কয়েকবার চোখের পাতা।

রসিকতায় কিশোরও হাসল। 'তা তো নিশ্চয়। আরও কম বয়েসী একজনকে খুঁজছি।'

'অ্যানিটার কথা বলছ না তো? ওর বয়েস কম, আটষট্টি।'

'আমরা খুঁজছি একজন তরুণীকে, অভিনেত্রী।'

'সাংবাদিক-টাংবাদিক নাকি তোমরা?'

'না, আমরা গোয়েন্দা,' জবাব দিল মুসা।

'ও, গোয়েন্দা? সাথে হিটার আছে? রড? গ্যাট?' পিস্তল-বন্দুকের পুরানো সব নাম ব্যবহার করল মহিলা। চোর-ডাকাতেরা এখনও কেউ কেউ এই নাম বলে, বিশেষ করে রড।

'না, আমরা টিভি ডিটেকটিভ নই।'

'আমরা তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' কিশোর বলল। 'আমাদের সাহায্য চেয়েছে একজন। তার ব্যাপারেই আলোচনা করতাম।' মহিলার চোখের দিকে তাকাল সে। 'আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন, মিস ডোভার?'

হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরাল পলি, ধূসর উইগ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিচের কোঁকড়া কালো চুল। অল্প বয়েসীদের চুল আর বুড়ো মানুষের মুখ নিয়ে এখন অদ্ভুত লাগছে তার চেহারা। 'কি করে বুঝলে?' গলার স্বর তরুণ হয়ে গেল হঠাৎ করেই।

'আপনার ডায়লগ শুনে। হিটার আছে? রড? গ্যাট? দি ফ্রেঞ্চ অ্যাজেন্ট ছবিতে আপনি ওই ডায়লগ বলেছিলেন। ছবিটা আমি দেখেছি।'

'চোখ কান খোলা রাখো তুমি!' সোজা হয়ে বসেছে অ্যাঞ্জেলা, বুড়ো মানুষের মত কুঁজো হয়ে বসার আর প্রয়োজন নেই। কোলের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিয়েছে। নীল জিনস পরেছে।

'আমার পরের ছবিটায় আমি পলির রোল করব, আশি বছর বয়েস। আশি বছর হলে কি করে মানুষ, না জানলে অভিনয় করতে পারব না, সে জন্যেই এখানে এসেছি কাছে থেকে দেখার জন্যে। এখানে ওই বয়েসের প্রচুর মানুষ আছে। ভাল অভিনয় করতে হলে দেখার ক্ষমতা খুব ভাল থাকা লাগে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অভিনয় করার কথা কখনও ভেবেছ?'

'ভেবেছে মানে?' মুসা বলল, 'কিশোর তো...'

জোরে কেশে উঠল কিশোর। মুসাকে শেষ করতে দিল না কথাটা। মোট্রামের অভিনয় করেছে, এটা নিয়ে কোন গর্ব তো নেইই, শুনতেও ভাল লাগে না তার। মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, 'বেন ডিলনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমরা, মিস ডোভার।'

মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। 'ব্যক্তিগত আলোচনা হয়ে যাবে।'

'ক্যাণ্ডাল নয়, আমরা চাই তথ্য। শেষ কখন ডিলনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার? কি কি কথা হয়েছে? কেউ তাকে হুমকি দিচ্ছে এরকম কি কিছু বলেছে? আপনাদের মাঝে রোমান্টিকতা কদ্দুর কি আছে না আছে জানতে চাই না আমরা।'

বেঞ্চে নড়েচড়ে বসল অ্যাঞ্জেলা। আঙুটি দিয়ে আলতো টোকা দিতে দিতে বলল, 'এক বছর ধরে আমার সঙ্গে প্রেম করার পর আমাকে ফেলে গেল সে। এটা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছি আমি। এতটাই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কাজকর্মই বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তারমানে,' কিশোর বলল, 'ডিলন মারাত্মক বিপদে পড়লেও আপনার কিছু এসে যায় না?'

'তা বলিনি। বিপদ সে ইচ্ছে করে টেনে আনে। মানুষকে ভোগায়। আমাকে ভুগিয়েছে। সিনেমা কোম্পানিকে ভুগিয়েছে।' মুসার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা, 'কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না?'

'কিশোরই তো বলছে।' গাল চুলকাল মুসা। 'গত শুক্রবার সকালে ডিলনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও বিপদে পড়েছে, বুঝতে পেরেছি।'

অ্যাঞ্জেলা বলল, 'এর আগের রাতে আমি গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।

'ডিনার খেয়েছি ওর বাড়িতে। সেদিন সাফোকেশন ছবিতে আমার কাজ শেষ হয়েছিল। তো, আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছ কেন? শেষ দেখেছি বলে?'

'আপনি শেষ দেখেননি। শেষ দেখা হয়েছে কিডন্যাপারদের সঙ্গে।'

'কিডন্যাপার!' আঁতকে উঠল অ্যাঞ্জেলা, 'অলিংগার জানে?'

'তার কাছেই পাঠানো হয়েছে র‍্যানসম নোট,' মুসা জানাল।

'বেচারা অলিংগার। মরেছে!'

'ডিলনের সঙ্গে কেমন কাটল আপনার সন্ধ্যাটা, বলবেন?' অনুরোধ করল কিশোর।

'চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল সে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ভুল করেছে, একথা শুনিয়ে, বোকার মত রসিকতাও করেছে। মনমেজাজ ভালই ছিল তার।'

'ডিলনের বন্ধু এবং শত্রুদের কথা কিছু বলবেন?'

'শত্রুর নাম বলতে শুরু করলে তো মাইলখানেক লম্বা হয়ে যাবে তালিকা। তবে বেশি রেগে-যাওয়ার কথা ডট কার্লসনের। সাফোকেশন টু-র নায়কের রোলটা পাওয়ার কথা ছিল তার। হঠাৎ করে ডিলনকে দিয়ে দেয়া হল। ফলে রেগে গিয়ে কিছু একটা করে বসাটা ডটের পক্ষে বিচিত্র নয়। ডিলনের গুরুটাকেও সন্দেহ করতে পার। পটার বোনহেডের কথায় ওঠবস করে ডিলন। যা করতে বলে তাই করে। বোনহেডই কিছু করেছে কিনা কে জানে।'

'খুব একটা সাহায্য আপনি করতে পারছেন না,' কিশোর বলল।

'সরি। তেমন কিছু জানিই না, কি করব বল?' উইগটা ঠিক করে তার ওপর হ্যাটটা বসিয়ে দিল আবার অ্যাঞ্জেলা, পলি সাজল। বুড়ো মানুষের গলা নকল করে বলল, 'ঠিক আছে, কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লে এস আবার। দেখি তখন কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।'

ওর কথার ধরনে হেসে উঠল কিশোর আর মুসা। গুডবাই জানিয়ে চলে এল নিজেদের গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠে কিশোর বলল, 'কাল স্কুল শেষ করে প্রথমেই স্টুডিওতে যাব, তোমার বাবা যা-ই বলুন।'

'আমি যেতে পারব না,' মুসা বলল। 'কারিহার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ও রেগে আছে।'

'ফারিহার সঙ্গে দু'দিন পরে দেখা করলেও চলবে। কিডন্যাপারদের কাছ থেকে হয়ত পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে গেছেন অলিংগার। তোমার কাজ তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ব্যস্ত রাখা।'

'ব্যস্ত রাখব? কেন?'

'কারণ স্টুডিওতে আমার কিছু কাজ আছে। জানিয়ে করা যাবে না কিছুতেই।'

অলিংগারকে ব্যস্ত রাখবে, পরদিন প্রযোজকের অফিসের বাইরে বসার ঘরে বসে কথাটা ভাবছে মুসা, কিন্তু কিভাবে? কথা বলে, নানা রকম কৌশল করে? সেটা রবিন আর কিশোরের কাজ, ওরাই ভাল পারে। জেদ চেপে গেল তার। ওরা পারলে সে পারবে না কেন?

আপাতত অলিংগারকে ব্যস্ত রাখার জন্যে মুসার দরকার নেই। নিজের ঘরে ব্যস্তই রয়েছেন তিনি। রিসিপশন রুমের চারপাশে চোখ বোলাল সে। আরেকজন লোক বসে আছে, অলিংগারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ঘন কাল চুল, উজ্জ্বল নীল ফ্রেমের সানগ্লাস পরেছে। আঙুল দিয়ে কখনও চেয়ারের হাতলে টাটু বাজাচ্ছে, কখনও নিজের উরুতে। লম্বা বেশি নয়। গায়ে শক্তি আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে জুতোর ডগা দিয়ে যেন ঠেলে সরানর চেষ্টা করছে পুরু কার্পেট।

'বেঞ্চের ফাইট কটায়?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'দুটো দশে?'

'দুটো বিশ।'

কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে আবার তাকাল মুসার দিকে। 'পাঞ্জা লড়ার অভ্যেস আছে?'

'আছে।'

'এসো, হয়ে যাক...'

'প্রডিসারের অফিসে?'

'অসুবিধে কি? বসে থাকার চেয়ে তো ভাল...' বলতে বলতেই সামনের টেবিল থেকে কফি কাপ আর ম্যাগাজিন সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে লাগল লোকটা। সোফা থেকে নেমে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে ডান কনুইটা রাখল টেবিলে, হাতের পাঞ্জা খোলা। ডাকল, 'এসো।'

গিয়ে টেবিলের অন্য পাশে হাঁটু গেড়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের কনুই টেবিলে রেখে চেপে ধরল লোকটার পাঞ্জা। চোখে চোখে তাকাল।

'শুরু!' বলল লোকটা।

লোকটা চেষ্টা করছে মুসার হাতকে চেপে শুইয়ে দিতে। চাপের চোটে কাঁপছে টেবিলটা। মুসা বেশি চাপাচাপি করছে না, শক্তি ধরে রেখে সোজা করে রেখেছে হাত। লোকটার শরীরে শক্তি আছে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকার ক্ষমতা নেই, এটা বুঝে ফেলেছে সে।

চোখ মিটমিট আরম্ভ হয়ে গেল লোকটার।

ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঢিল পড়ছে হাতের চাপে। সময় হয়েছে! আচমকা হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল মুসা। হাত সোজা রাখতে পারছে না লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করল সোজা রাখার, পারল না, কাত হয়েই যাচ্ছে, তারপর পড়ে গেল

টেবিলের ওপর। ককিয়ে উঠল সে, ব্যথায় নয়, পরাজিত হওয়ায়।

ঠিক এই সময় দরজায় দেখা দিলেন অলিংগার। রিসিপশন রুমে দু'জন লোককে ওই অবস্থায় দেখে থিধায় পড়ে গেলেন।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ছুটে গেল অলিংগারের দিকে। 'কত আর অপেক্ষা করবে, ব্রাউন? অনেক তো হলো।'

'শান্ত হও, ডট, শান্ত হও,' অলিংগার বললেন। 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ হবে তোমার?'

'ভেবে দেখো, ব্রাউন, সময় থাকতে,' বলল তরুণ লোকটা। ও-ই ডট কার্লসন, বুঝতে পারল মুসা। 'শুনলাম, ডিলন কেটে পড়েছে। ছবিটাকে ডোবাতে চাও?'

এই অভিনেতার কথাই অ্যাঞ্জেলা ডোভার বলেছিল, প্রথমে যাকে দি সাফোকেশন টু ছবির জন্যে পছন্দ করা হয়েছিল।

'ডট, আমার হাতে আর কিছু নেই এখন। তুমি জানো না। পরে কথা বলব।'

ইশারায় মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ডট, 'এ কে? ছবিতে অভিনয় করবে?'

'না।'

আরেকবার মুসার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ডট, আসলেই তাকে অভিনয় করতে আনা হয়েছে কিনা। শ্রাগ করল। তারপর রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

ক্লান্ত দৃষ্টি ফুটেছে অলিংগারের চোখে। রক্তশূন্য লাগছে চেহারা। 'কেমন আছ? চমৎকার কাজ করেছ গাড়িটাতে, আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

ভারি দম নিয়ে প্রযোজকের পিছু পিছু তাঁর অফিসে ঢুকল মুসা। টেবিলে পড়ে রয়েছে ওর বাবার হাতের আরেকটা কাজ। একটা চোখ, মণিতে কাঁটাচামচ গাঁথা। যতরকম বীভৎসতা সম্ভব, সব যেন ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে এই একটা ছবিতেই।

'মিস্টার অলিংগার,' বলল সে, 'কিডন্যাপাররা আর কোন খবর দিয়েছে?'

মাথা নাড়লেন প্রযোজক। টেবিলে পড়ে থাকা তিন গোয়েন্দার কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'তোমাদেরকে এই কেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম, তাই না? তাহলে ভাল হয়। কিডন্যাপাররা যা যা করতে বলে তাই আমাদের করা উচিত, তাহলে ডিলন ভাল থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, যেন সব বুঝতে পেরেছে। 'ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সাধারণত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে কিডন্যাপাররা, টাকাটা নিয়ে সটকে পড়তে চায়। এরা এত দেরি করছে কেন?'

'কিডন্যাপারদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানো মনে হয়?' হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটগুলো বেঁকে গেল অলিংগারের, মুসার কাছে সেটাকে হাসি মনে হলো না।

'কিডন্যাপ কেসের সমাধান আরও করেছি আমরা,' কিছুটা অহঙ্কারের সঙ্গেই বলল মুসা। 'আপনি আমাকে সরে থাকতে বলেছেন। কিছু মনে করবেন না,

আমার বন্ধু কিশোর পাশাকে নিয়ে এসেছি আজ স্টুডিওতে। ডিলনের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।'

পুরু একটা মিনিট ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন অসিংগার। তারপর মুখ নামালেন। মুসা ভেবেছিল মানা করে দেবেন, তা করলেন না। 'আইডিয়াটা ভাল। তা করতে পার। পটার বোনহেডকে দিয়ে শুরু করগে। ওই লোকটাকে আমার বিশ্বাস হয় না।'

পকেটের স্কটিকটার কথা মনে পড়ে গেল মুসার। মনে হতে লাগল, আবার গরম হয়ে উঠছে ওটা।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' অসিংগারের অফিস থেকে বেরিয়ে কিশোরকে খুঁজতে লাগল মুসা।

এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও ওকে পেল না সে। সাউণ্ড স্টেজে নেই, ক্যাফেটেরিয়ায় নেই। কোথায় গেল? একটা সিনারি শপের মোড় ঘুরে আরেকটু হলেই ওর গায়ে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল মুসা। 'খাইছে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঝেতে চিত হয়ে আছে কিশোর পাশা। গলায় লাল, মোটা একটা গভীর ক্ষত। জবাই করলে যেমন হয়।

সাত

একটা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারছে না দৌড়ে যাবে সাহায্য আনতে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে কোন অলৌকিক ক্ষমতায় আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে কিনা কিশোর? আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে। বুক ভেঙে যাচ্ছে কষ্টে। কিশোরের এই পরিণতি সহ্য করতে পারছে না সে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বন্ধুর বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা দেহের পাশে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল, 'কিশোর, কে তোমার এই অবস্থা করল!...বলো কে, কে করল...ওকে আমি, আমি...' মেঝেতে কিল মারতে শুরু করল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার মুসা। পাগল হয়ে গেছে যেন। কিশোরের কাটা গলার দিকে তাকাতে পারছে না। কাউকে ডেকে আনবে কিনা ঠিক করতে পারছে না এখনও। নড়ছে না কিশোর, মরেই গেছে সম্ভবত...

মুসার মনে হতে লাগল, দেয়াল চেপে আসছে চারপাশ থেকে, নিচে নেমে আসছে ছাত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, বলো কিশোর, কে?...' তাকাল কিশোরের গলার দিকে। 'আরি, রক্ত বেরোচ্ছে না কেন?'

বসে পড়ল আরেকবার। গলার পাশের মাটিতে আঙুল ছোঁয়াল। এক ফোঁটা রক্ত নেই, ধুলো লাগল আঙুলে। কাঁপা কাঁপা হাতে কিশোরের কাটা জায়গাটা ছুঁয়ে দেখল।

ভেজা নয়। রবার!

'মেকাপ!' আরেকবার চিৎকার করল মুসা, দুঃখে নয় এবার, রাগে। কিশোরের গায়ে জোরে একটা ঠেলা মেরে খেঁকিয়ে উঠল, 'অনেক হয়েছে! এবার ওঠো! এত শয়তানী করতে পারো...'

নড়ল না কিশোর। আরেকবার ঠেলা দিল মুসা। একই ভাবে পড়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। সন্দেহ হতে লাগল মুসার। রসিকতা নয়। সত্যিই কিছু হয়েছে কিশোরের। তাড়াতাড়ি ওর গলার নাড়িতে আঙুল চেপে ধরে দেখল ঠিক আছে কিনা। নাড়ি চলছে ঠিকই। নড়ছে না যখন, তার মানে বেহুঁশ হয়ে গেছে কিশোর। কি ঘটেছিল?

বসে রইল মুসা।

আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের মাথা, একপাশ থেকে আরেক পাশে। মৃদু গোঙানি বেরোল শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। চোখ মেলল অবশেষে।

'জেগেছ,' এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'ওঠো ওঠো।'

মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নড়ছেও না কথাও বলছে না।

'কথা বলতে ভুলে গেছ নাকি?'

'শ্‌শ্‌শ্‌,' চুপ করতে ইঙ্গিত করল মুসাকে কিশোর। 'কি ঘটেছিল, মনে করার চেষ্টা করছি।'

'জোরে জোরেই করো না, আমিও শুনি।'

উঠে বসল কিশোর। টলছে। 'দাঁড়াও...' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ভিজিয়ে নিল সে। 'ইনডোর শূটিঙের জন্যে যেখানে সেট ফেলেছেন রিডার, সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললাম। কিছু মূল্যবান তথ্য দিল ওরা আমাকে।'

'বেন ডিলনের ব্যাপারে?'

'না, শরীর ঠিক রাখার ব্যাপারে। সিনেমায় যারা অভিনয় করে, শরীরটাই তাদের প্রধান পুঁজি, নষ্ট হয়ে গেলে মরল।'

'ধুর! ওসব কথা শুনতে চায় কে? আমাকে জিজ্ঞেস করতে, কিভাবে ফিট রাখতে হয় আমিই বলে দিতাম।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'প্রোটিন মিল্ক শেক খায় ওরা, মুসা। এটা খেয়েই শরীরের ওজন কমিয়ে রাখে। ওরা বলে, সাংঘাতিক নাকি কাজের জিনিস। মনে হলো, আজ থেকেই আমিও শুরু করি না কেন? পেটে মেদ জমাকে আমার ভীষণ ভয়। চলে গেলাম স্টুডিওর কমিশারিতে এক গ্লাস মিল্ক শেক খাওয়ার জন্যে। ড্রিংক আসার অপেক্ষায় আছি, এই সময় খেয়াল করলাম বিশালদেহী একজন লোক আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। এমন ভাব করে রইলাম, যেন তাকে দেখিইনি। মিল্ক শেক নিয়ে বেরোতে যাব, দরজায় দাঁড়িয়ে আমার পথ আটকাল সে।

'একটা মুহূর্ত একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে বললঃ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরা যেটা খুঁজে পেয়েছি সেটা নয়, যেটা আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সেটা।'

'বলল ওরকম করে?' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা, 'তোমাকেও ধরেছে! বুঝতে পেরেছি, কে। পটার বোনহেড।'

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগোতে গিয়ে টলমল করে উঠল পা। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেল। পড়ে গেলে যাতে ধরতে পারে সে জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা।

'ঠিকই আছি, আমি পারব,' কিশোর বলল, 'ধরতে হবে না। যা বলছিলাম। মিল্ক শেক নিয়ে তখুনি বেরোলাম না আর। মনে হলো, এই লোক আমাকে অনেক খবর দিতে পারবে। প্রশ্ন শুরু করলাম তাকে। অনেক কথাই বলল সে, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। শেষে কিছুটা বিরক্তই হয়ে গেলাম। ওরকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বললে কি ভাল্লাগে নাকি! জিজ্ঞেস করলাম, শেষ কখন ডিলনকে দেখেছে। জবাব দিল, রোজই।'

'বললাম, কি আবল-তাবল বকছেন? শেষ কোথায় দেখেছেন?

জবাব দিল, 'আমার তৃতীয় নয়ন সারাক্ষণই দেখে তাকে।'

'বলো, কি রকম যন্ত্রণা! তৃতীয় নয়ন! নিজের কপালে যে দুটো আছে সে দুটোই ভালমত ব্যবহার করতে শেখেনি, আবার তৃতীয় নয়ন। হুহ্! রাগ হতে লাগল। তার পরেও জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আছে এখন বেন ডিলন? ঘুরিয়েই হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ব্রাউন অলিংগার। চিনে ফেললেন আমাকে। কি কুক্ষণেই যে মোটুরামের অভিনয় করতে গিয়েছিলাম! বললেন, হরর ছবিতে নতুন চরিত্র যোগ করতে যাচ্ছেন তিনি, আমি ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারি। কাজ মানে অভিনয়, বুঝতে পারলাম।'

গলা থেকে কুৎসিত কাটার দাগ আঁকা রবারটা টেনে খুলে ফেলল কিশোর। চামড়া থেকে রবার সিমেন্ট ছাড়াতে বেশ জোরাজুরি করতে হলো। 'কি করতে হবে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, কয়েকটা শট নেয়া হবে, তারই একটা মহড়া চলবে। আমাকে দিয়ে হলে আমাকেই নেবে, নয় তো অন্য কাউকে। অলিংগারের সঙ্গে কথা বলা যাবে, এই লোভেই কেবল ওদের গিনিপিগ সাজতে রাজি হয়ে গেলাম। ভুল করেছি। মেকআপের ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে রেখে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন কাজ কতটা এগোল দেখার জন্যে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই অ্যালার্ম দিতে শুরু করল ঘড়ি, প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন তিনি।'

'তুমি তখন কি করলে?' জানতে চাইল মুসা।

'কমিশারিতে ফিরে গেলাম। যেখানে বোনহেড আর আমার গ্লাসটা রেখে এসেছিলাম। গ্লাসটা ঠিকই আছে, কিন্তু বোনহেড নেই। খেয়ে গ্লাসটা খালি করে রেখে চলে এলাম এখানে। তারপর কি ঘটল, মনে নেই। চোখ মেলে দেখি তোমাকে।'

'ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল মিল্ক শেকে, কিশোর। বাজি রেখে বলতে পারি বোনহেডই করেছে এই অকাজ।' চট করে চারপাশে চোখ বোলাল একবার মুসা।

'মিল্ক শেকের গ্লাস খুঁজছ?' কিশোর বলল, 'পাবে না। এখানে আনিইনি। কমিশারিতে বেঞ্চের ওপর রেখেছিলাম। এখন গেলে পাবে না। পটার বোনহেডের

সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

পটার বোনহেডকে খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। ডিরেকটরির হলুদ পাতাগুলোর একটাতে নিচের দিকে রয়েছে ওর বিজ্ঞাপন, লস অ্যাঞ্জেলেসের ঠিকানায়। ইংরেজিতে লেখা বিজ্ঞাপন। হেডিঙের বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আধিভৌতিক পরামর্শদাতা'। নিচে ফলাও করে লিখেছে, কত রকমের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে তার। মানুষের মনের কথা পাঠ করা থেকে শুরু করে জটিল রোগের চিকিৎসা করা পর্যন্ত সব নাকি পারে। লিখেছে 'পৃথিবী হল আমার জবাব জানার যন্ত্র। আমার জন্যে মেসেজ রেখে দেয়। আমার প্রশ্নের জবাব দেয়। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

ঠিকানা দেখে বেডারলি হিলের একটা র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে পৌঁছল কিশোর আর মুসা। সাদা রঙের একটা লম্বা বাড়ি। সামনের দরজাটা খুলে আছে হাঁ হয়ে। ভেতরে দামি দামি আসবাবপত্র, ছবি রয়েছে। চোরের লোভ হতে পারে, কিন্তু পরোয়াই করে না যেন বাড়ির মালিক।

খোলা দরজার পাল্লায় টোকা দিল দুই গোয়েন্দা, সাড়া এল না। থাবা দিল, তাতেও জবাব নেই। শেষে ঢুকেই পড়ল ভেতরে, চলে এল পেছন দিকে। একটা সুইমিং পুলের কিনারে বসে সন্ধ্যার উষ্ণ বাতাস উপভোগ করছে বোনহেড। খোলা গা। সাদা একটা লিনেনের প্যান্ট পরনে। পদ্মাসনে বসেছে। চাঁদ উঠছে। বড় একটা তারা ঝিলমিল করছে আকাশে, যেন সুইমিং পুলের পানির মতই।

'কিশোর, লোকটাকে কোথাও দেখেছি,' মুসা বলল ফিসফিসিয়ে।

'তা তো দেখেছই। কয়েক দিন আগে, শুটিং স্পটে। একটা স্ফটিক দিয়েছিল তোমাকে।'

'না, ওখানে নয়, অন্য কোথাও দেখেছি।'

শ্রাগ করল কিশোর। পেশীবহুল শরীর লোকটার। সোনালি চুল। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগোতে লাগল সে।

চারটে বড় নীল স্ফটিক নিজের চারপাশে রেখে দিয়েছে বোনহেড। ওগুলোর একেকটাকে একেকটা কোণ কল্পনা করে কল্পিত রেখা আঁকলে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। হাতের তালুতে লাল একটা পাথর। কানের ফুটোতে দুটো সাদা পাথর, আর নাভিতে একটা সোনালি পাথর বসিয়ে দিয়েছে। চোখ বন্ধ।

'মিস্টার বোনহেড,' কিশোর বলল, 'যে আলোচনাটা শেষ করতে পারিনি আমরা, সেটা এখন শেষ করতে চাই।'

চোখ না মেলেই বোনহেড বলল, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কানে স্ফটিক ঢোকানো রয়েছে।'

'নতুন যুগ। পুরানো রসিকতা,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'আমার কানের স্ফটিকগুলো সমস্ত না-বোধক কাঁপন সরিয়ে রাখছে, তাতে মনের গভীরের সব বোধ সহজেই বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে। বলে দিচ্ছে, এখন যা আছি তা না হয়ে অন্য কেউ হলে কি হতে পারতাম। ওই বোধই আমাকে

জানিয়ে দিচ্ছে, বিষ ঢুকেছে তোমার শরীরে।'

'স্ফটিক আপনাকে একথা বলছে, আমাকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারবেন না,' কিশোর বলল। 'আমি ভাল করেই জানি, আপনিই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। মিল্ক শেকের গ্লাসে কি মিশিয়েছিলেন বলুন তো?'

শব্দ করে হাসল বোনহেড। পদ্মাসন থেকে উঠে নতুন করে সাজাতে লাগল চারপাশে রাখা স্ফটিকগুলো। 'ছ'টা বাজে। আমার সাঁতারের সময় হয়েছে।' বলেই পুলের কিনারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা।

পানিতে দাপাদাপি করছে বোনহেড। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, মুখ গোল, মুখের ভেতরে পানি ঢুকে যাচ্ছে।

'সাঁতার ভাল জানে না লোকটা,' কিশোর বলল।

'একেবারেই জানে না!' বুঝে ফেলেছে মুসা। একটানে জুতো খুলে ফেলেই ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক সেকেণ্ডেই পৌঁছে গেল খাবি খেতে থাকা লোকটার কাছে। পেছন থেকে গলা পেঁচিয়ে ধরে টেনে আনতে লাগল কিনারে। পানিতে ডোবা মানুষকে কি করে উদ্ধার করতে হয়, ভালই জানা আছে তার।

ভারি শরীর। দু'জনে মিলে কসরৎ করেও বোনহেডকে পানি থেকে তুলতে কষ্ট হলো কিশোর আর মুসার।

বোনহেড কথা বলার অবস্থায় ফিরে এলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'একাজ করতে গেলেন কেন? আমরা না থাকলে তো ডুবে মরতেন।'

'গতকাল তো তোমরা ছিলে না। ঠিকই সাঁতার কেটেছি। কই, মরিনি তো।'

'আপনার মাথায় দোষ আছে!' রাগ করে বলল কিশোর, 'আর একটা মিনিটও আমরা থাকব না এখানে! যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, শুনুন, বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমার সন্দেহ, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন। আমাদেরকে বলছেন না। না বললে নেই, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু ভাববেন না, এতে করে আটকাতে পারবেন আমাদেরকে। ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব আমরা ডিলনকে।'

বোনহেডের চেহারার পরিবর্তনটা মুসারও নজর এড়াল না। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছে কিশোর। কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিল ভবিষ্যদবক্তা। হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ডিলন কোথায় আছে আমি তোমাদেরকে বলতে পারব না। তবে ডিলন আমাকে বলতে পারবে সে কোথায় আছে।'

'আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে আশা করছেন নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ডিলন আমার ছাত্র। ছাত্র হলেই প্রথমে আমি ওদেরকে প্রয়োজনীয় স্ফটিক দিয়ে দিই। স্ফটিকগুলো সব আমার দিকে টিউন করা। কিংবা বলা যায়, আমরা যারা এই গ্রুপে আছি, তাদের সবার দিকে টিউন করা। আমাদেরকে চেনে ওগুলো। আমাদের চিন্তা পড়তে পারে, আমাদের স্বপ্ন বুঝতে পারে। কি পোশাক আমাদের পরা উচিত তা-ও বলে দিতে পারে। আমরা বহুদূরে চলে গেলে আমাদের

জন্যে মন কেমন করে ওগুলোর। নিঃসঙ্গ বোধ করে।'

'এতগুলো কথা তো বললেন, কিছুই বুঝলাম না!' ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছে কিশোরের।

'ডিলনের স্ফটিকগুলো নিয়ে এসো। আমি ওগুলোকে টিউন করে, প্রোগ্রাম করে চ্যানেল করে দেব। দেখবে কি ঘটে।'

'যেন ক্যাবল টিভি টিউনিং করছে আরকি!' আনমনে বিড়বিড় করল মুসা।

চোখ মুদল বোনহেড। 'স্ফটিকগুলো এনে দাও। বোনহেড কোথায় আছে বের করে দিচ্ছি।'

'স্ফটিক আপনাকে ডিলনের সন্ধান দেবে?' মুসারও অসহ্য লাগতে আরম্ভ করেছে এ ধরনের কথাবার্তা। 'যদি না জানে? যদি মন খারাপ থাকে, কিংবা রেগে গিয়ে থাকে আপনার ওপর, বলতে না চায়?'

'স্ফটিক বলবেই।'

এ ব্যাটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে ভরা উচিত এখনই! ভাবল মুসা।

ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বলে বসল কিশোর, 'ঠিক আছে, ওই কথা রইল তাহলে। আমরা স্ফটিকগুলো বের করে এনে দেব আপনাকে। যত তাড়াতাড়ি পারি।'

আট

গাড়িতে ফেরার পথে সারাটা রাস্তা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল মুসা। বোনহেডের ওপর রাগ। বলল, 'কিশোর, ওই ব্যাটাকে আমি চিনি। দেখেছি কোথাও। মনে করতে পারছি না। আর তুমিই বা চট করে রাজি হয়ে গেলে কি করে, স্ফটিকগুলো খুঁজে দেবে? ওরকম পাগলকে শায়েস্তা করাই তো তোমার স্বভাব। ফালতু কথা তুমি কখনই বিশ্বাস করো না।'

গাড়িতে উঠল কিশোর। সীটবেল্ট বাঁধল। হেসে বলল, 'এখনও করি না। আমাদেরকে কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে পটার বোনহেড, ইঙ্গিতে। কিংবা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাদের কাছে কিছু লুকাতে চেয়েছে। যা-ই করুক, আমি তার সঙ্গে খেলা চালিয়ে যাব। দেখিই না কি বেরোয়। এমনও হতে পারে, ডিলনের স্ফটিকগুলো সত্যি কোন একটা সূত্র দিয়ে বসল আমাদের।'

ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়ি থেকে স্ফটিকগুলো খোঁজা শুরু করবে ঠিক করল দু'জনে। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে, কিশোর কথা বলছে। আপনমনেই বকর বকর করতে থাকল বোনহেড, রিডার, ডিলন আর অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে।

একটা চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। সেই যে লারসেন, মুরগীর রাজা, যার কাহিনী বলা হয়েছে 'খাবারে বিষ' বইতে। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না। তবে খেতে বসলে তোমার বকবকানিটা তো বন্ধ হবে। আরিব্বাপরে বাপ, কানের পোকা নাড়িয়ে ফেলল!'

চুপ হয়ে গেল কিশোর।

আবার ডিলনের বাড়িতে চলল মুসা। বাড়িতে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার সময় আর ভাল লাগল না তার। তবু কিশোরের সঙ্গে এগোতে লাগল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সাবধানে সদর দরজার দিকে এগোল দু'জনে। এখনও খোলা, তালা নেই।

ভেতরে উঁকি দিল মুসা। আসবাবপত্র যেখানে যেভাবে পড়ে ছিল, সেভাবেই রয়েছে, ঠিক করা হয়নি। করবেই বা কে?

'কেউ কিছু ছোঁয়নি,' বলল সে।

'এগোও।'

আবার এগোল দু'জনে। মুসা আগে আগে। পায়ের তলায় মড়মড় করে কাচ গুঁড়ো হওয়া শুরু হয়েছে। কাচের গুঁড়োর সঙ্গে এখন মিহি বালি মিশেছে। সৈকত থেকে উড়ে এসে পড়েছে ওই বালি।

'সাংঘাতিক একটা লড়াই হয়ে গেছে এখানে,' মুসা বলল।

'বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। চোখ বোলাচ্ছে ঘরে। মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের গুঁড়ো পরীক্ষা করে বলল, 'স্ফটিকের গুঁড়ো নয় এগুলো। অসমান। স্ফটিক ভাঙলে ছোট স্ফটিকই হয়ে যায় আবার।'

'তাহলে কোত্থেকে এল?'

'রহস্য।'

ডিলনের স্ফটিক খুঁজতে লাগল ওরা। মুসা চলে এল শোবার ঘরে। খানিক পরে বাড়ির পেছন দিক থেকে কিশোরের ডাক শোনা গেল, 'দেখে যাও!'

হল পেরিয়ে দৌড়ে পেছনের বেডরুমে চলে এল মুসা, এখান থেকে সাগর দেখা যায়। বুকশেলফের সামনে ঝুঁকে রয়েছে কিশোর, একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে।

মুসার সাড়া পেয়ে বলল, 'পটার বোনহেডের অটোগ্রাফ দেয়া তারই লেখা বই। এই দেখো, অনেক বই লিখেছে,' জোরে জোরে নাম পড়তে লাগল কিশোর, 'ইনফিনিটি স্টপস হিয়ার, আউট অভ বডি এক্সপিরিয়েনসেস, হাউ টু বি ইউর অউন বেস্ট ট্র্যাভেল এজেন্ট, দি থার্ড আই বুক অভ অপটিক্যাল ইলিউশন, গেটিং রিচ বাই গোইং ব্রোকঃ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি।'

দম নিতে কষ্ট হওয়ার অনুভূতিটা হলো আবার মুসার। বলল, স্ফটিকগুলো এখানে নেই, কিশোর। আমি গাড়িতে গিয়ে বসি। তুমি দেখে তাড়াতাড়ি চলে এসো, অন্য কোথাও খুঁজব।'

গাড়িতে বসে আছে তো আছেই মুসা, কিশোরের আর দেখা নেই। তিরিশ মিনিট পরে এল সে।

'এত দেরি করলে?'

'অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে ফোন করেছিলাম।' কিশোর জানাল, 'ও বলল, স্ফটিক ছাড়া কখনও কোথাও যায় না ডিলন। ভয়ের দৃশ্যগুলোতে অভিনয় করার দিন পুষ্পরাগমণি সাথে করে নিয়ে যায় সে। রোমান্টিক দৃশ্যে নীলকান্তমণি। কোয়ার্জ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যেদিন জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটি নেয়ার কথা। সেই

দিনই গায়েব হয়ে গেল ডিলন। আগের দিন নাকি ওর ক্লোজ-আপ নেয়া হয়েছিল।'

'কোথায় যাব? মুভি স্টুডিওতে?'

'গোরস্থানে।'

'গোরস্থান! কিশোর, কি জানি কেন, আমাদের কেসগুলো খালি গিয়ে গোরস্থানে শেষ হতে চায়! অনেক কেসই তো হল! এবারেরটাও কি তাই হবে?' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'একেক সময় মনে হয়, গোরস্থানে থাকার জন্যেই যেন আমাদের জন্ম হয়েছিল। আর কোথাও গেলে হয় না এখন? কাল দিনের বেলা নাহয় যাব।'

'রাতে যেতে ভয় লাগছে তো?' হাসল কিশোর। 'সাথে করে স্ফটিক নিয়ে যাওয়ার অভ্যেস ডিলনের। অ্যাঞ্জেলার কাছে জানলাম, ছোট একটা বাক্সতে ভরে ওগুলো নিয়ে যেত সে। গত বিষ্যুৎ বারেও নিয়েছিল। অ্যাঞ্জেলা বলল, শুটিঙের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার ট্রাকগুলো এখনও গোরস্থানেই রয়েছে।'

'থাক। এতদিনে যদি কিছু না হয়ে থাকে, আজকে এক রাতে আর হবে না। পঞ্চাশ মাইল দূর। এখন রওনা হলেও যেতে যেতে মাঝরাত হয়ে যাবে।'

কিন্তু মুসার কথা শুনল না কিশোর।

রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে ড্যালটন সিমেট্রির পাশে এনে গাড়ি রাখল মুসা। হেডলাইট নিভাল। নভেম্বরের শুকনো বাতাস চাবুক হেনে গেল যেন ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। এমন ভাবে দুলে উঠে কাছাকাছি হতে লাগল ডালগুলো, মনে হল মাথা দুলিয়ে আলাপে ব্যস্ত ওরা।

'আমি এখানেই থাকি,' মুসা বলল। 'ইঞ্জিনটা চালু থাক। রেডিও অন করে দিই।'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর, 'তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। নিরাপত্তার জন্যে সাথে স্ফটিক রয়েছে...'

'নেই। বাড়িতে রেখে এসেছি। পকেটে রাখতে পারি না। গরম লাগে।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘও আছে। পাগলা ঘোড়ার মত যেন ছুটে চলেছে মেঘগুলো। ফলে ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়ছে চাঁদ, আবার বেরিয়ে আসছে। ঝিঁঝি ডাকছে। ছোট জানোয়ারেরা ছুটোপুটি করছে ঝোপের ভেতর। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল কিশোর, গড়িয়ে পড়তে লাগল। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মুসা, ফসকে গেল।

গড়ান থামল একসময়। উঠে বসে কিশোর বলল, 'ধাক্কা মারলে কেন?'

'কই? আমি তো ধরতে চেষ্টা করলাম। কিসে হোঁচট খেলে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। 'কি জানি, বুঝতে পারলাম না।'

দূরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। ব্যথা পেয়ে কেঁউক করে উঠে চুপ হয়ে গেল। তারপর স্তব্ধ নীরবতা।

টর্চ হাতে আগে আগে চলল মুসা। 'গোরস্থানের আরেক ধারে চলে যেতে

হবে। সার্ভিস রোডের ধারে দেখেছিলাম ট্রাকগুলোকে। হয়তো ওখানেই আছে।'

দু'জনেই টর্চ জ্বেলে রেখেছে। কিশোর ধরে রেখেছে সামনের দিকে। মুসা সামনেও ফেলছে, আশপাশেও ফেলছে আলো। মাঝে মাঝে ঘুরে পেছনেও দেখছে। কাজেই, ওটা যখন ছুটে এল, দেখতে পেল না সে, ওই সময় পেছনে তাকিয়ে ছিল। বাতাসের ঝাপটা লাগল দু'জনের গায়েই। তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল ওটা।

'বাপরে!' বলে বসে পড়ল মুসা। 'ভূ-ভূ-ভূ-ত!'

'আরে দূর, পেঁচা! কি যে কাণ্ড করো না! খাবার পায়, দেখে চুপচাপ এলাকা, পেঁচা তো এখানে থাকবেই।'

'লেকচার দিতে কে বলেছে তোমাকে? থামো।' সার্ভিস রোডের দিকে আলো ফেলল মুসা। 'একটা গর্ত পেরিয়ে যেতে হবে। কবরের মত করে খোঁড়া। ওখানে গুটিঙের বন্দোবস্ত করেছিল ওরা। আমার বিশ্বাস, থাকলে স্পেশাল ইফেক্ট লেখা ট্রাকটাতেই আছে বাক্সটা।'

'পথ দেখাও।'

'দাঁড়াও। কি যেন শুনলাম।'

'এসো,' সামনে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

নরম কার্পেটের মত পায়ের নিচে পড়ছে ঘাস। বাতাসে ভেসে আসছে মিষ্টি, ভারি এক ধরনের গন্ধ, কাপড়ে লেগে আটকে যাচ্ছে যেন।

'দাঁড়াও!' কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে তাকে থামাল মুসা। 'বললাম না, শব্দ শুনেছি!'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কান পেতে রইল দু'জনেই। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে এল না।

'ভুল শুনেছ,' কিশোর বলল। 'কল্পনা।'

'তুমি নিজেও শিওর নও, কিশোর; তোমার কণ্ঠস্বরই বলছে।'

'চলো।'

যেতে ইচ্ছে করছে না মুসার, কিশোরের চাপাচাপিতেই কেবল এগোচ্ছে। পাহাড়ী পথ। অন্ধকারে ঠিকমত দেখে চলতে না পারলে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। ঠিক জায়গার দিকেই এগোচ্ছে তো? সন্দেহ হলো তার।

না; ঠিকই এসেছে, খানিক পরেই বুঝতে পারল। নতুন খোঁড়া কবরটা দেখতে পেল সে। ওটার পাড়ে এসে দাঁড়াল দু'জনে। ভেতরে আলো ফেলল। টর্চের আলোয় যেন হাঁ করে রইল গভীর করে খোঁড়া শিশিরে ভেজা গর্তটা। আশেপাশে কোন ট্রাক দেখা গেল না। সার্ভিস রোডটা শূন্য।

'গেল কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

'এখানেই তো ছিল। সরিয়ে ফেলেছে বোধহয়।'

'খুব খারাপ হয়ে গেল। এত কষ্ট করে এসে শেষে কিছুই না।' ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর 'শব্দ শুনেছ বললে না...'

কথা শেষ হলো না। মাথার পেছনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। চিৎকার করে উঠল সে। মুসাকেও চিৎকার করতে শুনল। তারপরই কালো অন্ধকার যেন গিলে নিল

তাকে।

নয়

মাথার ভেতরে কেমন জানি করছে মুসার। কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছে না। কোথায় পড়েছে? কি হয়েছিল? মনে পড়ল আস্তে আস্তে। মাথায় বাড়ি লেগেছিল। শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে, ডালটাল দিয়ে। কিশোর কোথায়?

মাথা তোলার চেষ্টা করল মুসা। দপদপ করছে। ভীষণ যন্ত্রণা। কোনমতে তুলে দেখল কবরটার ভেতরে পড়ে আছে সে। কিশোর রয়েছে তার পাশে। অনড়। শক্তি পাচ্ছে না। আবার মাথাটাকে ছেড়ে দিল মুসা, থপ করে পড়ে গেল ওটা নরম মাটিতে। চোখের সামনে কালো পর্দা ঝুলছে যেন। ওটাকে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। বেহুঁশ হতে চাইছে না। কি হয়েছিল? আবার ভাবল। ওঠো, হুঁশ হারাবে না, নিজেকে ধমক লাগাল সে।

একটা শব্দ হলো। শিউরে উঠল মুসা। নিজের অজান্তেই। যে লোকটা বাড়ি মেরেছে ওদেরকে, এখনও রয়েছে কবরের পাড়ে। মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল মুসা, পারল না।

গায়ে এসে পড়ল কি যেন।

খাইছে! মাটি! বেলচা দিয়ে কবরের পাড়ের আলগা মাটি ফেলা হচ্ছে ভেতরে! জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলার ইচ্ছে!

কবরের পাড় থেকে উঁকি দিল একটা মুখ। চেহারাটা দেখতে পেল না মুসা, তবে চাঁদের আলোয় চকচক করা বেলচাটা ঠিকই চিনতে পারল। সরে গেল মুখটা। আবার এসে মাটি পড়তে লাগল কবরের ভেতরে।

চিৎকার করে উঠল মুসা। 'নাআআ!' নিজের কানেই বেখাপ্পা, অপার্থিব শোনাল চিৎকারটা।

যত ব্যথাই করুক, কেয়ার করল না আর সে। জোরে জোরে গালমুখ ডলে আর মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল। হাতে লেগে থাকা কাদা মুখে লেগে গেল। ভেজা মাটির গন্ধ।

ওপর থেকে মাটি পড়া থেমে গেল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হল মুসা। উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করতে লাগল। কবরের ভেজা দেয়াল ধরে ধরে উঠল অবশেষে। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'কিশোর, ওঠ! এই কিশোর, উঠে পড়ো! কিশোর···আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে···'

নড়ে উঠল কিশোর। তাকে উঠতে সাহায্য করল মুসা। শার্টের বুক খামচে ধরে টেনে টেনে তুলল।

'হয়েছে···হয়েছে···' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'কোথায়···কি···' কথা বলার শক্তি নেই যেন। দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলার চেষ্টা করছে শরীর থেকে।

কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে এর পরের জরুরি কাজটায় মন দিল মুসা। কবরের দেয়ালে হাতের আঙুল আর জুতোর ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা চালাল। খুব একটা কঠিন কাজ না। মাথায় যন্ত্রণা না থাকলে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। তবে এখন যথেষ্ট কষ্ট হলো।

বাইরে বেরিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। নির্জন গোরস্থান। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে আগের মতই। ও হ্যাঁ, আরেকটা ডাকো, কুকুরটা ডাকতে আরম্ভ করেছে আবার।

কবরের পাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। প্রায় টেনে তুলল কিশোরকে। হাঁপাতে লাগল দু'জনেই। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে আছে।

'জলদি এসো,' মুসা বলল, 'ব্যাটাকে ধরতে হবে। নিশ্চয় পালাতে পারেনি এখনও।'

'না,' শার্ট থেকে মাটি সরাতে সরাতে বলল কিশোর, 'আড়ালে থেকে নজর রাখব আমরা। তাতে ওকে অনুসরণ করা যেতে পারে। পিছু নিয়ে দেখতে পারব কোথায় যায়।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল আবার দু'জনে। একটা ক্যামারো গাড়িকে ছুটে যেতে দেখল হেডলাইট জ্বেলে, লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে। মিনিট খানেক পরেই ভেগাটা চালিয়ে মুসাও রওনা হয়ে গেল। পাশে বসেছে কিশোর। ছোট গাড়িটাকে যতটা সম্ভব দ্রুত ছোটানোর চেষ্টা করল মুসা, কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চায় না ক্যামারোটাকে।

হান্টিংটন বীচ, লং বীচ পেরিয়ে এসে লস অ্যাঞ্জেলেসে ঢুকল গাড়ি। বেভারলি হিলের দিকে এগোল।

এলাকাটা পরিচিত লাগল মুসার কাছে। বলল, 'কয়েক ঘণ্টা আগেও না এখানে ছিলাম?'

স্ট্রীট লাইটের আলোয় পলকের জন্যে ক্যামারোর ড্রাইভারকে দেখতে পেল সে। বয়েস খুব কম মনে হলো, বড় জোর উনিশ, সাদা একটা হেডব্যাণ্ড লাগিয়েছে মাথায়। বাঁয়ে মোড় নিল লোকটা। এই রাস্তাও মুসার পরিচিত। পটার বোনহেডের বাড়ির দিকে যাচ্ছে গাড়িটা।

আগের মতই এখনও খুলে রয়েছে বোনহেডের বাড়ির সদর দরজা। ক্যামারো থেকে নেমে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। কিশোর আর মুসাও ছুটল পেছনে।

ভোর হয়ে আসছে। তাজা বাতাসে অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে দু'জনের মাথার যন্ত্রণা, ঘোলাটে ভাবটা দূর হয়ে গেছে। মোমের আলো জ্বলছে বিরাট বাড়িটার ঘরে। আলো লেগে ঝিকঝিক করছে স্ফটিক। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকতে লাগল গোয়েন্দারা, বোনহেডকে খুঁজছে।

'ইঁদুর মনে হচ্ছে নিজেকে,' মুসা বলল, 'ফাঁদের দিকে যাচ্ছি।'

'যাইই না। পনির থাকতেও পারে।'

হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। বড় একটা ঘরের ভেতর শত শত মোম জ্বলছে। সাথে করে এক যুবক আর এক মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বোনহেড। দু'জনের বয়েসই বিশের কোঠায়।

'এত রাতে আমাদের সাথে দেখা করেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' লোকটা বলল। একটা চেক বাড়িয়ে দিয়েছে বোনহেডের দিকে। 'যাই। আরও মক্কেল এসেছে দেখি?'

'সত্য সন্ধানীরা তাদের হাতঘড়ি হারিয়ে ফেলেছে,' বোনহেড বলল রহস্যময় কণ্ঠে, তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসার দিকে, চোখে বিচিত্র দৃষ্টি।

'আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে যদি লিখে রাখতে পারতাম,' মহিলা বলল, 'ভবিষ্যতে কাজে লাগত। যাই হোক, আপনি যে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। ওর জন্মদিনটা আনন্দে কাটুক, ও খুশি থাকুক, এটাই আমি চেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড নাইট।'

দু'জনে বেরিয়ে গেলে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক হাসি হাসল বোনহেড। 'স্ফটিকগুলো পাওনি তোমরা। বুঝতে পারছি।'

'না, পাইনি,' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলো মুসা, কেমন খড়খড়ে হয়ে গেছে। 'গোরস্থান থেকে এলাম।'

'এখন এসেছি অন্য জিনিস খুঁজতে,' কিশোর বলল, 'সাদা হেডব্যাণ্ড পরা একজন লোককে।'

চারপাশে তাকাল বোনহেড। 'ওরকম কাউকে তো দেখছি না।'

'তৃতীয় নয়ন ব্যবহার করুন,' মুসা বলল।

'ওর পেছন পেছন এখানে ঢুকেছি আমরা,' বলল কিশোর।

মুখের ভাব বদলে গেল বোনহেডের, যেন মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে। 'ও, তোমরা নিকের কথা বলছ বোধহয়। আমার ছাত্র। ওকে কি দরকার?'

'একটু আগে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিতে চেয়েছিল,' ভারি গলায় বলল কিশোর। 'ড্যালটন সিমেট্রিতে গিয়েছিলাম ডিলনের স্ফটিকগুলো খুঁজতে। মাথার পেছনে বাড়ি মেরে আমাদের বেহুঁশ করে ফেলে দেয় আপনার ছাত্র, তারপর মাটি দিয়ে ভরে দিতে চায়।'

'নিক?' মোলায়েম গলায় ডাকল বোনহেড। 'শুনে যাও তো?'

হলের দরজায় এসে দাঁড়াল সাদা হেডব্যাণ্ড পরা যুবক।

'এই লোকই,' বলে উঠল মুসা। মুঠো হয়ে গেল হাত। ভদ্রতার ধার দিয়েও গেল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন? বাড়ি মেরেছিলে কেন?'

'কি বলছ?' নিক অবাক। 'সারারাত তো ঘরেই ছিলাম আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে বেরোইনি।'

'মিথ্যে কথা! আমরা আগের বার যখন এসেছিলাম, তখনই আমাদের পিছু নিয়েছিলে!'

'সারারাত ঘরে ছিলাম,' একই স্বরে বলল নিক। 'তোমরা ভুল করছ।' একটি

বারের জন্যেও বোনহেডের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে গেল সে।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' রেগে গিয়ে বোনহেডকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তোমার বোঝার সাধ্য হবে না,' বলল বোনহেড। 'যতক্ষণ না মনের খোলা অংশকে আরও খুলতে না পারবে।'

চোখ উল্টে দেয়ার উপক্রম করল কিশোর। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'প্লীজ, আবার শুরু করবেন না ওসব কথা!' বোনহেড চুপ করে আছে দেখে বলল, 'অনেকেই আমাদের কাছ থেকে কথা লুকানোর চেষ্টা করেছে, আগে। পারেনি। প্রতিবারেই ওদের কথা টেনে বের করেছি আমরা, মুখোশ খুলে দিয়েছি। আপনিও পারবেন না। বেন ডিলনের ব্যাপারে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন আপনি।'

শ্রাগ করল বোনহেড। হ্যাঁ-না কিছু বলল না। আরেক কথায় চলে গেল, 'ডিলনের এই গায়েব হয়ে যাওয়াটা যারা তাঁকে চেনে তাদের সবার কাছেই বেদনাদায়ক, ওর নিজের কাছেও। মনের খোলা অংশ আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে। ও হলো ফাইণ্ডিং দা পাথ নামের চমৎকার সেই ভাস্কর্যটার মত। ভাস্কর্যটার চারটে পা, একেকটা একেক দিক নির্দেশ করছে।'

ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা, 'শেষ কবে আপনি ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

প্রশ্নটা অবাক করল বোনহেডকে। 'বীচের বাড়ি? কখনও যাইনি। আমি যাব কেন? ছাত্ররাই শিক্ষকের বাড়ি আসে।'

'তাহলে ভাস্কর্যটার কথা কি করে জানলেন? ওটা দেখেছি ডিলনের বাড়িতে। পা উল্টে পড়ে থাকতে। আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকেও ভাঙা হয়েছে।'

'ওটার কথা আপনি জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

প্রশ্নের জবাবেই যেন বিশাল থাবার মুঠো খুলল বোনহেড। হাতের তালুতে একটা বড় বেগুনী পাথর। আবার শক্ত করে বন্ধ করে ফেলল মুঠো। 'মূল্যবান কাঁপুনি শুরু হয়েছে স্ফটিকের। আমি যাই।'

ওদেরকে বেরিয়ে যেতে বলল বোনহেড, ঘুরিয়ে। ভারি পায়ে থপথপ করে হেঁটে চলে গেল যে ঘরে মোমবাতি জ্বলছে সেদিকে। কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চারপাশের মোমগুলো নিভে যাচ্ছে একের পর এক।

'ডিলনের বাড়ির ভাস্কর্যটার কথা বলে একটা ভাল কাজ করেছ,' কিশোর বলল।

'থাক আমার সঙ্গে,' রসিকতা করে বলল মুসা, 'দিনে দিনে আরও কত কিছু দেখতে পাবে।'

প্রায় দুটো বাজে। বোনহেডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। আরেকবার মুখে লাগল রাতের তাজা হাওয়া। হাই তুলতে শুরু করল ওরা। বিশ্রাম চায়, বুঝিয়ে দিল শরীর।

'সোজা এখন বিছানায়,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বলল মুসা। 'তোমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাব।'

'নিকের ব্যাপারে কি করবে?' ডানের সাইড-ডোর মিররের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'নিক বসে আছে ওর গাড়িতে। আমরা কোথায় যাই দেখার জন্যেই বোধহয়।'

রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাল মুসা। বেশ কয়েক গজ পেছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকের ক্যামারো। মুসার মুখ থেকে হাসি চলে গেল। 'বেশ, পিছু নেয়ারই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, নিতে দেব ব্যাটাকে। আসতে থাকুক। ক্যারাবুঙ্গায় গিয়ে খসিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ, তাই কর।' আরাম করে সিটে হেলান দিল কিশোর।

'পেছনে কেউ লেগেছে জানলে ভুলভাল ড্রাইভিং শুরু করে লোকে,' মুসা বলল।

'হুঁ!' মিররের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিকের গাড়ির দিকে চোখ।

'যে তোমাকে ফলো করছে তার সঙ্গে খুব রহস্যময় আচরণ করা উচিত তোমার।' বলতে থাকল মুসা, 'এই যেমন ধর, হলুদ লাইট দেখলে জোরে চালিয়ে পার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি পেছনের লোকটা পেরোতে না পারে? তোমাকে হারিয়ে ফেলবে সে। মজাটাই নষ্ট। আর ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে বারবার লেনও বদল করা চলবে না। তোমার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হবে সে...'

'আহ্, বকবকটা থামাও না! ক্যারাবুঙ্গার তিন ব্লক দূরে খসাবে।'

'তাহলে এখুনি গুড নাইট বলে নিতে পার নিকি মিয়াকে।' একবারেই একসিলারেটর অনেকখানি চেপে ধরল মুসা। একটা ওয়ান-ওয়ে পথ ধরে ছুটল একটা ব্লকের দিকে। ভুল পথে যাচ্ছে সে, উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসতে দেখল না, তাই রক্ষা। নইলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারত। আচমকা ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তায় লাফাতে শুরু করল গাড়ি। কয়েক গজ এগিয়েই ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। মাথা নিচু করে রইল সে আর কিশোর।

আপন গতিতেই নিঃশব্দে এগিয়ে ক্যারাবুঙ্গা মোটরসের পুরানো গাড়ির সারিতে এসে ঢুকে পড়ল মুসার ভেগা। ব্রেক কষল সে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ব্লকটা ঘুরে আসছে নিক।

'আমাদেরকে পাবে না,' কিশোর বলল। 'খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে না পেয়ে ফিরে যাবে।'

'মিস্টার নিক,' খিকখিক করে শয়তানী হেসে বলল মুসা, 'এইবার আমাদের পালা। তুমি কোথায় যাও আমরা দেখব। কোন ইন্টারেস্টিং জায়গায় নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

দশ

নিকের সঙ্গে চলল দুই গোয়েন্দার ইঁদুর-বেড়াল খেলা। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে

খেলাটা। রাত দুটোর বেশি। এই সময় রাস্তায় যানবাহনের ভিড় খুব কম। নিকের অগোচরে থাকার জন্যে কয়েক ব্লক দূরে থেকে অনুসরণ করতে হচ্ছে মুসাকে।

'এত কষ্ট তো করছি,' হাই তুলে বলল সে, 'ফল পেলেই হয় এখন।'

'আমি কি ভাবছি জানো?' কিশোর বলল, 'নিক আমাদেরকে ডিলনের কাছে নিয়ে যাবে। যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।'

সোজা হয়ে বসল মুসা। গতি বাড়িয়ে ক্যামারোর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল। 'বোনহেড আর নিক এই কিডন্যাপে জড়িত?'

শীতল, ভোঁতা গলায় জবাব দিল কিশোর, 'ওরা মিথ্যুক।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের সম্ভ্রান্ত এলাকা বেল এয়ারে এসে ঢুকল ওরা। তিনতলা গোলাপী রঙ করা একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল নিক। টালির ছাত বাড়িটার। চাঁদের আলোয় উইলো গাছ বিচিত্র ছায়া ফেলেছে, যেন বাড়িটার পটভূমিতে ঘাপটি মেরে রয়েছে একটা বেড়াল।

গাড়ি থেকে বেরোল নিক। ঘুমন্ত অঞ্চলটার ওপর চোখ বোলাল। গাড়ি থেকে কালচে রঙের একটা ব্যাকপ্যাক বের করে পিঠে বেঁধে সাবধানে এগোল অন্ধকার বাড়িটার দিকে। ওর আচরণেই বোঝা যাচ্ছে, সিকিউরিটি সিসটেমে পা দিয়ে বসার ভয় করছে।

'চুরি করে ঢোকার তালে আছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নইলে দরজায় টোকা দিত।'

ওরাও বেরোল গাড়ি থেকে। অনেক বেশি সতর্ক হয়ে আছে। সিকিউরিটি সিসটেম চালু করে বিপদে পড়তে চায় না ওরাও। নিকের হাতে ধরা পড়তে চায় না।

বাড়ির সামনের দিকে এগোল নিক, প্রতিটি জানালা দেখতে দেখতে।

পুরানো মোটা একটা গাছের আড়ালে লুকাল কিশোর আর মুসা।

'কি করছে?' মুসার প্রশ্ন।

'জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে,' কিশোর বলল। 'বাড়িতে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখো, ছোট একটা জিনিস ধরে রেখেছে মুখের কাছে। নিশ্চয় টেপ রেকর্ডার। কথা বলছে।'

কথা বলা শেষ করে একটা ক্যামেরা বের করে অন্ধকার জানালার ভেতর দিয়ে ছবি তুলতে লাগল নিক। তারপর গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'বোনহেডের ওখানেই গেল,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম আমরা। এগোতে আর পারলাম না।'

চুপ করে রয়েছে কিশোর। কিছু বলছে না।

গাড়িতে উঠেও চুপ হয়ে রইল সে। সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসেছে তিন গোয়েন্দা। রবিনও এসেছে।

আগের রাতের ঘটনাগুলোর কথা তাকে বলছে অন্য দু'জন।

'সাংঘাতিক কাণ্ড করে এসেছ,' রবিন বলল। 'কিন্তু ডিলনের হলোটা কি? তাকে কি বের করা যাবেই না?'

'কাল রাতে পাইনি বলে যে কোনদিনই পাব না, তা হতে পারে না,' কিশোর বলল। 'একটা জরুরী কথা জানতে পেরেছি কাল। ডিলনের ওপর বোনহেডের খুব প্রভাব।'

'এবং বোনহেড মিছে কথা বলেছে,' যোগ করল মুসা। 'বলেছে, ডিলনের বাড়িতে কখনও যায়নি, অথচ ওই বাড়িতে যে একটা ভাস্কর্য আছে সেটা জানে।'

ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কিছু ভাবছে। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় ভুল লোকের পিছে ছুটেছি আমরা...'

ট্রেলারের দরজায় টোকা পড়ল। ক্ষণিকের জন্যে জমে গেল যেন সবাই। দরজা খোলার আগে শার্টটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে নিল কিশোর।

'হাই,' বলল একটা মেয়ে। ওর লম্বা, সোনালি চুল এলোমেলো হয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। সবুজ চোখ। 'রবিন আছে?'

'আঁ!' অস্বস্তি আরও হয়ে গেছে কিশোরের। পেছনে তাকিয়ে রবিনের মুখ দেখে নিল একবার। তারপর মেয়েটার দিকে ফিরে ডাকল, 'এসো, ভেতরে।'

'আই, রবিন,' একটা হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা, 'বেশি তাড়াতাড়ি চলে এলাম?...বাপরে, কি জায়গা!'

'তাড়াতাড়ি? না না, আসলে আমিই ভুলে গিয়েছি। জরুরী আলোচনা চলছে তো...পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কিশোর পাশা...'

'সুন্দর নাম তো,' মেয়েটা বলল। 'নিশ্চয় আমেরিকান নয়?'

'না। বাংলাদেশী...আর ও মুসা আমান।'

'হাই,' বলল মুসা। 'কোন হাই স্কুল?'

'হলিউড হাই,' হেসে বলল রবিন, মেয়েটার হয়ে। 'ওর নাম চায়না।'

মেয়েটাও হাসল। হাসার সময় নিচের ঠোঁটে কামড় লাগে তার। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আরও দেরি হবে?'

'না,' অস্বস্তি বোধ করছে রবিনও। যাওয়ারও ইচ্ছে আছে, আবার এখানেও থাকতে চায়। আমতা আমতা করে শেষে বলে ফেলল, 'কিশোর, আজ রাতে চায়নাদের বাড়িতে পার্টিতে একটা ব্যাণ্ড গ্রুপ পাঠাতে হবে। আমাকে যেতে হচ্ছে এখন।'

'যেতে হলে যাও,' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আর কদিন পরে তোমার চেহারাই ভুলে যাব আমরা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা। 'কেন যে বড় হতে গেলাম! ছোট ছিলাম আগে, সে-ই ভাল ছিল...'

'হ্যাঁ, সময় তো আর সব সময় এক রকম যায় না,' কষ্ট রবিনেরও হচ্ছে। 'ভাবছি ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটাই ছেড়ে দেব। আমার লাইব্রেরিই ভাল। দেখি...'

অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে চায়না। কথাবার্তা ঠিক বুঝতে

পারছে না।

'তোমরা চালিয়ে যাও,' বেরোনোর আগে বলল রবিন। 'জরুরী প্রয়োজন পড়লে ফোন করো আমাকে।'

দু'জনে বেরিয়ে গেলে কিশোর বলল, 'মেয়েটাকে দেখলে?'

'ভালমত,' জবাব দিল মুসা।

'ভাবতে অবাক লাগে, বুঝলে, এই সেই আমাদের মুখচোরা রবিন! কি স্মার্ট হয়ে গেছে। আর মেয়েগুলোও যেন সব ওর জন্যে পাগল। আচ্ছা, আমাদের দিকে তাকায় না কেন, বলো তো?'

'ভুল বললে। তোমার দিকে তো তাকায়ই, তুমিই তাকাও না। মেয়েদের সামনে মুখ ওরকম হাঁড়ির মত করে রাখলে কি আর পছন্দ করবে ওরা? তোমার কথাবার্তাও বড় বেশি চাঁছাছোলা। আসলে একমাত্র জিনাই সহ্য করতে পারে তোমাকে, তুমিও পারো। দু'জনেরই স্বভাব এক তো...'

হাত নাড়ল কিশোর। 'বাদ দাও মেয়েদের আলোচনা; আসল কথায় আসি...আমাদের কেস...'

পরদিন শনিবার। সৈকতে সাঁতার কাটতে গেল তিন গোয়েন্দা। নভেম্বর সাঁতারের মাস নয়। কেবল মুসার মত পানি-পাগল কিছু মানুষ ছাড়া সাগরে যেতে চায় না। আবহাওয়াটা সেদিন ভাল বলে কিশোর আর রবিনকে রাজি করাতে পেরেছে সে। কিন্তু সৈকতে এসে মত পরিবর্তন করল দু'জনে। শেষে একাই গিয়ে পানিতে নামতে হলো মুসাকে। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে ভাল না লাগায় উঠে এল। ইয়ার্ডে ফিরে চলল ওরা।

পরদিন শনিবার। হেডকোয়ার্টারের বাইরে দুটো পুরানো চেয়ারে বসে কথা বলছে কিশোর আর মুসা। এই সময় রবিনের গাড়িটা ঢুকতে দেখা গেল।

গাড়ি থেকে নামল রবিন আর চায়না।

'এই সেরেছে রে!' বলে উঠল মুসা, 'একেবারে বান্ধবীকে নিয়েই হাজির!'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল কিশোর। কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল রবিন আর চায়নার দিকে।

এগিয়ে এল রবিন। 'বুঝলে কিশোর, খুব ভাল গাইতে পারে চায়না। গত রাতে পার্টি ও একাই মাত করে রেখেছিল।'

'তাই নাকি? খুব ভাল,' দায়সারা জবাব দিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'আরও একটা ভাল ব্যাপার আছে,' হেসে বলল রবিন। কিশোরের চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছে। 'প্লটার বোনহেডের ব্যাপারে আর আগ্রহ আছে?'

ঝট করে মুখ তুলল কিশোর। 'কেন? কিছু জেনেছ নাকি?'

চায়নার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'তুমিই বলো?'

'বোনহেডের সমস্ত বই আমি পড়েছি।' একটা চেয়ারে বসল চায়না। ঝাঁকি দিয়ে মুখ থেকে চুল সরাল। 'একটা মেটাফিজিক্যাল মিনিকিউব। তবে এই বয়েসেও বাদিং সুটে ভালই লাগে ওকে।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল

রাতে চায়নাদের বাড়ির সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নেমেছিল বোনহেড।'

পুরো সতর্ক হয়ে গেছে কিশোর।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কিন্তু ও তো সাঁতার জানে না!'

'সেটা কি আর মানতে চায়,' রবিন বলল। 'মনের খোলা অংশ না কি ঘোড়ার ডিম নিয়ে লম্বা এক লেকচার ঝেড়ে দিল। ছয় জন লোক গিয়ে তুলে এনেছে তাকে, নইলে ডুবেই মরত। ওস্তাদ শোম্যান বলতে হবে। একজন বৃদ্ধার দিকে তার নজর, মহিলা সাংঘাতিক ধনী। আরও কি করেছে, শোনো। দাঁড়াও, দেখাই,' একটা ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনল রবিন। 'একটা স্ফটিককে এরকম করে হাতের তালুতে রেখে বিড়বিড় করে কি পড়ল। তারপর মহিলার কপালে ছোঁয়াল, এমনি করে,' বলে চায়নার কপালে পাথরটা ছুঁইয়ে দেখিয়ে দিল কি ভাবে ছুঁইয়েছে বোনহেড। 'ভারি গলায় বলতে লাগল,' লোকটার স্বর নকল করে বলার চেষ্টা করল রবিন, 'মিসেস অ্যাণ্ডারসন, আপনার সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়নি আমার। অথচ আমি অনুভব করছি, আমাদের পথ দু'দিক থেকে এসে এক জায়গায় মিলিত হতে যাচ্ছে।'

আর চুপ থাকতে পারল না চায়না। মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অনুকরণে বলল, 'কি যে বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার বাড়ির দেয়ালে,' বোনহেডকে অনুকরণ করল রবিন, 'শগলের আঁকা একটা ছবি ঝুলছে। কাঠের ফ্রেম। ডান দিকে নিচের কোণটা ভাঙা। পড়ে গিয়েছিল হয়তো।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন! আপনি জানলেন কি করে?' চায়না বলল।

ওর কপালে নুড়িটা আলতো করে ছুঁইয়ে চোখ মুদল রবিন। 'আরও অনেক কিছুই জানি আমি। একটা অ্যানটিক সিরামিক বাউলে একটা বেড়াল ছানা ঘুমিয়ে আছে!'

'আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য!' চিৎকার করে উঠল চায়না, দক্ষিণাঞ্চলীয় টানে। অবশ্যই টানটা মিসেস অ্যাণ্ডারসনের।

আবার চায়নার কপালে পাথর ছোঁয়াল রবিন। 'উইলো গাছটাও দারুণ। বাড়ির ওপর ছায়া ফেলেছে এমন করে, মনে হচ্ছে একটা বেড়ালের ছায়া।'

'উইলো গাছ? বেড়ালের ছায়া?' চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'নিক!'

তার দিকে তাকাল না রবিন। অভিনয় চালিয়ে গেল। চায়নার দিকে মাথা সামান্য নুইয়ে বাউ করে বলল, 'আশা করি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি সব।'

'তাহলে এই ব্যাপার,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর। 'সে রাতে মিসেস অ্যাণ্ডারসনের বাড়িতেই গিয়েছিল নিক, তথ্য জোগাড় করতে, চায়নাদের পার্টিতে মহিলাকে তাজ্জব করে দেয়ার জন্যে।'

'করতে পেরেছে,' রবিন বলল। 'গেঁথে ফেলেছে মহিলাকে। পরামর্শ দাতা হিসেবে বোনহেডকে বহাল করতে রাজি হয়ে যাবে মিসেস অ্যাণ্ডারসন। বললেই মোটা অংকের চেক লিখে দেবে।'

'শয়তান লোক! ঠগবাজ!'

'ডিলনের বাড়িতে না গিয়েও এভাবেই ভাস্কর্যটার কথা জেনেছে বোনহেড,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় ছবি তুলে নিয়ে এসেছিল নিক।'

'আমিও তখনই বুঝতে পেরেছি, ঠকাচ্ছে,' রবিন বলল। 'মুখের ওপর বলার সাহস হয়নি। গায়ের জোরে পারতাম না। কারাত-ফারাত কিছু খাটত না ওর সঙ্গে, পিষে ফেলত আমাকে।'

'আমি হলাম একটা গাধা!' জোরে জোরে কপালে চাপড় মারল মুসা। 'রামছাগল! নইলে ভুললাম কি করে!'

'কি ভুলেছ?'

'বলেছি না,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, বোনহেডকে আগেও কোথাও দেখেছি, শুটিং স্পটে দেখার আগে। ও হল টমি দা টু-টন টিটান! অনেক বছর আগে টিভিতে দেখতাম ওকে, রেসলার ছিল। রিঙে উঠত দুটো কাল ধাতুর টুকরো নিয়ে। গুল মারত একেকটা টুকরো একেক টন। সে জন্যেই নাম হয়েছে টু-টন। আরও চাপাবাজি করত। বুকে চাপড় মেরে বলত, আমি হলাম পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী রেসলার।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে কিশোর। রবিন আমার বিশ্বাস, মুসা কাল রাতে ভজঘট করে দেয়ার পর আর ফোন ধরছে না ডিলন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তখন অলিংগারকে বেরোতেই হবে। যেখানে লুকিয়ে আছে ডিলন। আমরা তখন তার পিছু নেব।'

চোদ্দ

দুপুর নাগাদ মুভি স্টুডিওর পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে পড়ল ব্রাউন অলিংগারের চকচকে কালো পোরশি ক্যাব্রিওলে গাড়িটা। দ্রুত চলছে। হাত নাড়ল গার্ড, জবাব দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না প্রযোজক। বড় বেশি তাড়াহুড়া আছে মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে বেপরোয়া ছুটতে শুরু করলেন। মোড়ের কাছে গতি কমালেন না। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে নাক ঘোরালেন গাড়ির। আতঙ্কিত হয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে লাগল অন্যান্য গাড়ি।

ভেগার স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে আছে মুসা। রাস্তার অন্য পাশে গাড়ি রেখেছে। অলিংগারের গাড়িটাকে ওরকম করে ছুটে যেতে দেখে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের মেসেজ পেয়েছে।'

'এবং বিশ্বাস করে বসেছে,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মুসাও রওনা হলো। বেশ খানিকটা দূরে থেকে অনুসরণ করে চলল পোরশিকে। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বেশি। ফলে চেষ্টা করেও গতি তুলতে পারছেন না অলিংগার। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের সীমা ছাড়িয়ে আসার আগে আর পারলেনও না।

পেছনে পড়ল শহরের ভিড়। তীব্র গতিতে ছুটছেন এখন অলিংগার। মুসাও

পাল্লা দিয়ে চলেছে। পথের দু'পাশে এখন সমতল অঞ্চল, বেশির ভাগই চষা খেত। কিছুদূর চলার পর মোড় নিয়ে মহাসড়ক থেকে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল পোরশি। ধুলো উড়িয়ে ছুটল আঁকাবাঁকা রুক্ষ পাহাড়ী পথ ধরে। ঢুকে যেতে লাগল পর্বতের ভেতরে। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে পাইন আর রেডউডের জঙ্গল।

এই পথে পিছু নিলেই চোখে পড়ে যেতে হবে। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো মুসা। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে তিন ঘন্টার পথ চলে এসেছে। এতদূর এসে শেষে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। প্রয়োজন হলে গাড়ি রেখে হেঁটে যাবে, তা-ও ফেরত যাবে না।

তা-ই করল ওরা। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে রইল গাড়িতে, পোরশিটাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর নেমে পড়ল। জোর কদমে ছুটল। হাঁটাও নয়, দৌড়ানও নয়, এমনি একটা গতি। ডবল মার্চ বলা যেতে পারে।

পথের প্রথম বাঁকটার কাছে একটা কাঠের কেবিন চোখে পড়ল। চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার সরু একটা রেখা উঠে যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশে। ওখানেই ঢুকেছে নিশ্চয়? কি করছে ওটার ভেতরে দু'জনে, ভাবল মুসা। ডিলন কি বলে ফেলেছে সে অলিংগারকে ফোন করেনি?

'ভেতরে আগুন জ্বলছে, ভালই,' মুসা বলল। 'যা শীত। আগুন পোয়াতে ইচ্ছে করছে আমার।' দুই হাত ডলতে শুরু করল সে। পর্বতের ভেতরে ঠাণ্ডা খুব বেশি। আর শুধু টি-শার্ট পরে এসেছে ওরা। শীত লাগবেই।

'পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকব?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না,' কিশোর বলল, 'সামনে দিয়ে ঢুকেই চমকে দেব।'

সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। তারপর রেডি—ওয়ান-টু-থ্রী করে একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল পাল্লায়। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকল। প্রথমেই ডিলনকে দেখার আশা করেছে।

কিন্তু ডিলনকে দেখল না।

বড় একটা ঘর। আসবাবপত্রে সাজানো। কেবিনটা যে কাঠে তৈরি সেই একই কাঠে তৈরি হয়েছে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, কাউচ, বুককেস। জগিং করে শীত তাড়ানর চেষ্টা করতে দেখা গেল অলিংগারকে। উদ্বিগ্ন, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারা, পরাজিত দৃষ্টি সব দূর হয়ে গিয়ে অন্য রকম লাগছে এখন তাঁকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে খুশিই হলেন।

'আরি, তোমরা? এখানে কি?' ঘড়ি অ্যালার্ম দিতেই জগিং থামিয়ে দিলেন তিনি। কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন একটা তোয়ালে দিয়ে। ঘাড়েও ঘাম। কপাল মোছা শেষ করে ঘাড়ে চেপে ধরলেন তোয়ালে।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না তিন গোয়েন্দা। তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে গিয়ে ডিলনকে খুঁজতে শুরু করল। ডিলন যে নেই সেটা জানতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'এখানে কি?' প্রশ্নটা আবার করলেন অলিংগার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চমকাননি, যেন জানতেন ওরা আসবে। 'আমাকেই ফলো করছ, সন্দেহ হয়েছিল।

এখন দেখি ঠিকই।'

'পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি আমরা,' ভোঁতা গলায় মুসা বলল।

'সাপ খুঁজতে!' শীতল কঠিন দৃষ্টিতে অলিংগারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'ডোনাট খাবে?' হাসি হাসি গলায় জিজ্ঞেস করলেন অলিংগার।

'ডোনাট?' অবাক হয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, হচ্ছেটা কি?'

শ্রাগ করল কিশোর। বিমল হাসি হাসলেন অলিংগার। আগের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক হয়ে উঠেছে আচরণ। 'খেলে খেতে পার। অতিরিক্ত ফ্যাট। সে জন্যে আমার খেতে ভয় লাগে। তবু মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে পারি না। মেহমান আসবে বুঝতে পেরেছি। তাই বেশি করেই নিয়ে এসেছি। কমিশারি থেকে। আর ঠিক এসে গেলে তোমরা। চমৎকার কোইনসিডেন্স, তাই না?'

'কেবিনটা কার?' জানতে চাইল কিশোর।

সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। আবার জগিং শুরু করলেন তিনি। 'আমার। এখানে এসেই শরীরের ব্যাটারি রিচার্জ করি আমি।'

'একা?'

'মোটেও না।'

দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক।

'প্রকৃতির কোলে এসে কখনও একা হবে না তুমি,' বললেন অলিংগার। 'তাজা বাতাস। সুন্দর সুন্দর গাছ। বুনো জানোয়ার। সব সময় ঘিরে থাকবে তোমাকে। এত বেশি, ছত্রিশ ঘন্টার বেশি সহ্যই করতে পারি না আমি। আবার পালাই শহরে।'

ঘড়ির সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার জগিং থামালেন তিনি। মুখের ঘাম মুছে তোয়ালেটা সরিয়ে আনার পর মনে হল তোয়ালে দিয়ে ঘষেই মুখের চওড়া হাসিটা ফুটিয়েছেন। 'তোমাদেরকে কিন্তু খুব একটা খুশি মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি?'

'আজ আপনার অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ পেয়েছেন,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'আপনি ভেবেছেন, বেন ডিলন আপনার সাহায্য চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। সে জন্যেই এখানে এসেছেন আপনি। আপনি জানেন, ডিলন এখানেই লুকিয়ে আছে।'

'ডিলন এখানে?' হা হা করে হাসলেন অলিংগার। 'চমৎকার। দারুণ। দেখো তাহলে। বের করতে পার কিনা। যাও, দেখো।'

এত আত্মবিশ্বাস কেন? মনে মনে অবাক হলেও চেহারায় সেটা ফুটতে দিল না কিশোর। মেঝে, আসবাব, সব কিছুতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। মাথা চুলকাতে লাগল সে।

'ধুলো ছড়ানোটা কোন ব্যাপার না,' মুসা বলল। 'ডজনখানেক স্প্রে ক্যান আছে আমাদের বাড়ির বেসমেন্টে, বাবার জিনিস। এই স্পেশাল ইফেক্ট দেখিয়ে

আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না।'

'কল্পনার জোর আছে তোমাদের মানতেই হবে,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন অলিংগার। 'তবে ভুল করছ। আমি কোন মেসেজ পাইনি আজ। চাইলে গিয়ে আমার অ্যানসারিং মেশিন চালিয়ে দেখতে পারো তোমরা। কোন মেসেজ নেই। এখানে সেলিব্রেট করতে এসেছি আমি।'

'কিসের সেলিব্রেট?' মুসার প্রশ্ন।

'অবশ্যই ডিলনের মুক্তির। অবাক হলে মনে হচ্ছে? খবরটা শোননি? টাকা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়েছে কিডন্যাপাররা। এটাই আশা করেছিলাম আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে অলিংগারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ছাড়ল?'

'কয়েক ঘন্টা আগে।' প্যান্ট্রিতে গিয়ে ডোনাটের বাক্স খুললেন অলিংগার। গ্লাস বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধ খাবে নিশ্চয়? দুধ তোমাদের দরকার। বেড়ে উঠতে, বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে দুধ। তোমাদের এখন খুব দরকার।'

'তার মানে এখন সাফোকেশন টু শেষ করতে পারবেন?'

হাসলেন অলিংগার। তবে এই প্রথম তাঁর চোখে বিস্ময়ের আলো ঝিলিক দিয়ে যেতে দেখল কিশোর। 'নাহ্, আর পারলাম না। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন আর সাফোকেশন টুর শুটিং শেষ করা সম্ভব না। তাছাড়া এত বড় একটা বিপদ থেকে এসে ডিলনেরও মনমেজাজ শরীর কোনটাই ভাল না। এই অবস্থায় অভিনয় করতে পারবে না। শ্রমিক কর্মচারী আর অন্য অভিনেতাদেরও মন খারাপ হয়ে গেছে। ছবি এইটা খতম। কেউ যদি না যায় কাকে পরিচালনা করবে জ্যাক রিডার?'

'তাই। ছবিটা তাহলে আর করতে চান না। আপনি বুঝে ফেলেছেন, এই অখাদ্য গিলবে না দর্শকেরা। তাই যা খরচ হয়েছে সেটা তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে চান। খরচ হয়ে যাওয়া দুই কোটি ডলার।'

'দুই কোটি?' দুধ ঢালতে ঢালতে বললেন অলিংগার, 'আরও অনেক বেশি খরচ হয়েছে।'

'হয়তো। এবং সেটাই আপনি ফেরত চান। ছবি শেষ না করলে ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেবে না...'

অলিংগারের হাত থেকে গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

ভাঙা কাচ...ভাঙা কাচ...ভাঙা কাচ...মুসার মগজে যেন তোলপাড় তুলল ভাঙা কাচের শব্দ।

'ছবির ব্যাপারে অনেক বেশি জানো তোমরা,' প্রযোজক বললেন। 'এতটা, ভাবতে পারিনি। ঠিকই আন্দাজ করেছ। ছবিতে লোকসান হলে সেটা দিতে বাধ্য বীমা কোম্পানি, বীমা সে জন্যেই করান হয়। টাকাটা আদায় করার মধ্যে কোন অন্যায় দেখি না আমি।'

'কিন্তু কিডন্যাপিঙের খেলা খেলে,' কর্কশ গলায় বলল কিশোর। 'টাকা আদায় করাটা কেবল অন্যায় নয়, পুলিশের চোখে ঠগবাজি।'

হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল অলিংগারের চেহারা থেকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দৃষ্টি। 'অস্বীকার করছি না তবে পুলিশকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। তোমরা এখন যেতে পার। আলোচনা শেষ।'

শহরে ফেরার পথে গাড়ির হিটার চালু করে দিল মুসা। তবু ঠাণ্ডা যাচ্ছে না তার, শরীর গরম হচ্ছে না। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর, পাঁচটার খবরটা শোনার জন্যে অস্থির। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে, রকি বীচ থেকে তখনও অনেক দূরে রয়েছে ওরা, পথের ধারে পুরানো একটা খাবারের দোকান চোখে পড়ল কিশোরের। বাড়িটার সব কিছুই জীর্ণ মলিন, কেবল একটা স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা ছাড়া।

'অ্যাই, রাখো তো।' গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে।

দোকানে একজন খদ্দেরও নেই। বাবুর্চি দাঁড়িয়ে আছে একহাতে প্লেট আর আরেক হাতে কাঁটাচামচ নিয়ে। প্লেটে ডিম ভাজা।

'খবর দেখবেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, অনেকটা অনুরোধের সুরেই।

এক চামচ ডিমভাজা মুখে পুরে দিয়ে টেলিভিশনের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। প্রায় ছুটে গিয়ে টিভি অন করে দিল কিশোর। পর্দায় ফুটল 'ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ'।

'কিছু কিছু অভিনেতা হিরোর অভিনয় করে, কিন্তু আজ একজন অভিনেতা প্রমাণ করে দিয়েছেন বাস্তবেও তিনি হিরো,' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলছে টিভি অ্যাংকারপারসন। 'আজ সকালে জনপ্রিয় অভিনেতা বেন ডিলনকে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন তিনি। পুলিশকে বলেন, এগারো দিন বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। একটু আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এই বন্দি থাকার কাহিনী তিনি শোনান সাংবাদিকদেরকে। একজন ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ রিপোর্টারও ছিল সেখানে...'

চলতে আরম্ভ করল ভিডিওটেপ। পর্দায় দেখা গেল বেন ডিলনকে। উত্তেজিত হয়ে আছে, থানায় বসে আছে মাইক্রোফোনের সামনে। সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে তার বিখ্যাত নীল চোখ। সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করার দুর্নাম আছে এমনিতেই ডিলনের, আর এখন তো সে মানসিক চাপেই রয়েছে।

'কিডন্যাপারের চেহারা কেমন জানিয়েছেন পুলিশকে?' জিজ্ঞেস করল একজন রিপোর্টার।

'নিশ্চয়ই। একেবারে আপনার মত,' অভদ্রের মত বলল ডিলন। 'আন্দাজেই তো বলে ফেললেন। কি করে জানাব? আমি কি ওদের চেহারা দেখেছি নাকি? দিনের বেলা সব সময় চোখ বেঁধে রাখত আমার। রাতে খুলে দিলেই বা কি? আলো জ্বলত না। ঘর থাকত অন্ধকার। কাউকে দেখতে পেতাম না।'

'ডিলন, অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি আবার ভাল হবে

মনে হয়?'

'এটাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে কে? আরে মিয়া, আমি কি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নাকি এখন? এগারো দিন আটকে থেকে আসার পর মেয়েমানুষের কথা কে ভাবে?'

'ক'জন কিডন্যাপার ছিল?'

'বললাম না, আমি ওদের দেখিইনি।'

'গলা শুনেই লোক শুনে ফেলা যায়,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ব্যাটা মিথ্যে বলছে। অভিনয় করে ধোঁকা দিচ্ছে।'

'লোকগুলোও তো ধোঁকায় পড়ছে,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন।

'ওরা আপনাকে মারধর করেছে?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন রিপোর্টার।

'না, করবে না। পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল তো!' মুখ বাঁকিয়ে হাসল ডিলন। 'যত্তসব! সব কথা শোনা চাই। আমাকে বেঁধে রেখেছে, পিটিয়েছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি ব্যথায়। তা-ও ছাড়েনি। এখন তো মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে ধরে পিটাল না কেন, তাহলে কিছুটা শিক্ষা হত। আপনারা যেমন খবরের জন্যে খেপে গেছেন, ওরাও তেমনি টাকার জন্যে খেপে গিয়েছিল।'

আরও কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেন বিরক্ত হয়েই মাইক্রোফোনের কাছ থেকে উঠে চলে গেল ডিলন। পুলিশ বিশ্বাস করেছে তার কথা, রিপোর্টাররাও করেছে। তাদের ভাবভঙ্গিতেই বোঝা গেল সেটা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, মিথ্যে বলেছে লোকটা, ঠকিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

ফেরার পথে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মুসা। আচমকা ফেটে পড়ল, 'ব্যাটা বদমাশ!' রাগে টেবিলে চাপড় মারার মত চাপড় মারল স্টিয়ারিঙে, চাপ লেগে হর্ন বেজে উঠল। পুলিশ বিশ্বাস করেছে যখন, পারই পেয়ে গেল ওরা! এত্তবড় একটা শয়তানী করে। ভুলটা হল কোথায় আমাদের?'

কিশোর জবাব দিল, 'ভুল আমাদের হয়নি। ওরা আসলে আমাদের ফাঁদে পা দেয়নি। কোন ভাবে সতর্ক হয়ে গেছে।'

'তার মানে আমরা কিছু করতে পারলাম না ওদের?' পরাজয়টা রবিনও মেনে নিতে পারছে না। কিশোর আর রবিনকে যার যার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরল কিছুক্ষণ মুসা। শেষে রওনা হলো ফারিহাদের বাড়িতে। কিছুতেই কেসের ভাবনাটা মন থেকে সরাতে পারছে না। মনে হচ্ছে পরাজয়ের আসল কারণ সে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কিশোরকে জানাত, তাহলে এরকমটা ঘটত না। কিন্তু আসলেই কি তাই? এখন আর জানার কোনই উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতেই ফারিহাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল। হেডলাইট জ্বেলে রেখেই গাড়ি থেকে নেমে এল সে। বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে এল ফারিহার ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিল। বারান্দার আলোটা জ্বলল। খুলে গেল দরজা। ফারিহা দাঁড়িয়ে আছে।

'হাই,' মুসা বলল।

'হাল্লো, কাকে চাই? তোমাকে চিনি বলে তো মনে হয় না? পথ হারালে নাকি? এটা আমাদের বাড়ি। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারও নয়, গাড়ির গ্যারেজও নয়।'

'বাইরে চল। কথা আছে।'

'বলো না এখানেই। আমি শুনছি।' রেগে আছে ফারিহা। তবে বেরোল মুসার সঙ্গে।

'দেখো ফারিহা, ঝগড়াঝাটি করার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার এখন।' ফারিহার হাত ধরল মুসা, 'মাঝে মাঝে কি যে হয়ে যায় আমার, কি পাগলামি যে করে বসি...'

সরাসরি ওর দিকে তাকাল ফারিহা। 'মুসা, কি হয়েছে তোমার? এরকম ভেঙে পড়তে তো তোমাকে দেখিনি কখনও?'

পকেট থেকে স্ফটিকটা বের করল মুসা, পটার বোনহেড যেটা দিয়েছিল তাকে। ফারিহার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ।'

'কি এটা?'

'এমন একটা জিনিস, যা আর রাখতে চাই না আমি।'

'কেন?'

'কারণ এটা থাকলেই বার বার মনে হবে, একটা রহস্য আমি একা একা সমাধান করতে চেয়েছিলাম। শেষে পুরোটা ভজঘট করে দিয়েছি।'

পনেরো

চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পরাজয়ের কথাটা ভুলতে পারল না মুসা। পারল না কিশোরও। চিকেন লারসেনের স্পেশাল মুরগীর কাবাব দিয়ে সেটা ভোলার চেষ্টা করছে।

চুপচাপ তাকিয়ে ওর খাওয়া দেখছে মুসা। ঘন ঘন ওঠানামা করছে কিশোরের হাতের চামচ। দেয়াল কাঁপিয়ে বাজছে হাই ফাই স্টেরিও, পঞ্চাশের দশকের রক মিউজিক।

'কিশোর, তিন নম্বরটা খাচ্ছ,' মুসা বলল।

কিশোরের চোখ ক্ষণিকের জন্যে উঠল। কিন্তু চামচের ওঠানামা বন্ধ হল না। চিবান বন্ধ হলো না। মাথা নাড়ল না।

হঠাৎ সামনের দরজার বেল বাজল। ঘরে ঢুকল রবিন। একটা চেয়ার টেনে বসল সে। 'শোনো, খবর আছে একটা। ভোর বেলায় মিস্টার বার্টলেটের কাছে ফোন এসেছে। জরুরী তলব। জানো কে?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'আজকাল মাথা আর খেলে না আমার। রহস্যের সমাধান করতে পারি না।'

'শোনই আগে কে ফোন করেছিল। দেখো, এটার সমাধান করতে পার কিনা। জ্যাক রিডার ফোন করেছিলেন। ডিলানের সম্মানে কাল রাতে তাঁর বাড়িতে একটা

পার্টি দিচ্ছেন। মরগান'স ব্যাণ্ড দরকার।'

'তাহলে মরগানের খুশি, আমাদের কি?' মুখ গোমড়া করেই রেখেছে মুসা।

রবিন বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছ না তোমরা। ডিলনের মুখ থেকে সত্যি কথা আদায়ের এটা একটা মস্ত সুযোগ।'

'কেন?' আরেকটু মাংস মুখে পুরল কিশোর, 'আমাদেরও দাওয়াত করেছে নাকি?'

'করলেই কি না করলেই কি,' হাসল রবিন। 'শোনো, আমার বুদ্ধি শোনো। সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট, কালো বো টাই আর সানগ্লাস পরে চলে যাব আমরা। যে ক্যাটারিং সার্ভিসকে ভাড়া করেছেন রিডার, ওরা এই পোশাক পরেই যাবে। পার্টি চলাকালে ঢুকে পড়ব, কেউ আমাদের আলাদা করে চিনতে পারবে না।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। কিশোরও চিবান বন্ধ করল।

পরদিন রাত ন'টায়, পুরোদমে পার্টি চলছে, এই সময় রিডারের বেল এয়ারের বাড়িতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে। তিনজনে তিনটে খাবারের ট্রে তুলে নিয়ে চলে এল মেহমানরা যেখানে ভিড় করে আছে সেখানে। ক্যাটারিং সার্ভিসের ওয়েইটারেরা খুব ব্যস্ত, ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, বাড়তি তিনজন যে ঢুকে পড়েছে ওদের মধ্যে খেয়ালই করল না।

'ডিলন কোথায়?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হরর অথবা ভূতের ছবি তৈরি করার মত করেই যেন সাজানো হয়েছে রিডারের বাড়িটা। মধ্যযুগীয় কায়দায় ভারি ভারি করে তৈরি হয়েছে আসবাব, খোদাই করে অলঙ্করণ করা হয়েছে। রক্তলাল মখমলে মোড়া গদি। দেয়ালে ঝাড়বাতি। লোহার বড় বড় মোমদানীতে জ্বলছে বড় বড় মোম। কালো কাপড়ে লাল রঙে লেখা, ইংরেজিতে লেখা হয়েছে ব্যানার, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরেছ বলে স্বাগতম, ডিলন। আঁকাবাঁকা করে আঁকা হয়েছে অক্ষরগুলো, দেখে মনে হয় নিচ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। লিভিংরুমের মাঝখানে ঝোলানো হয়েছে ব্যানার। তার নিচে বিশাল কাচের ফুলদানীতে রাখা হয়েছে লাল গোলাপ।

সুইমিং পুলের দিকে মুখ করা বারান্দায় বাজনা বাজাচ্ছে মরগানের দল। হলিউডের সিনেমা জগতের বড় বড় চাঁইয়েরা অতিথি হয়ে এসেছে। খাচ্ছে, নাচছে, আনন্দ করছে।

'ওই যে অলিংগার,' দেখাল রবিন। বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে, নইলে বোঝা যায় না। 'আমাদের দিকে তাকালেই সরে যেতে হবে।'

'ডিলন কোথায়?' একজন ওয়েইটারকে এগিয়ে আসতে দেখে আরেক দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিশোর।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে প্রায় ছোঁ মেরে মুসার চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিলেন রিডার। 'ঘটনাটা কি?'

'ইয়ে···ইয়ে···মানে···ইয়ে···' থেমে গেল মুসা। কথা আটকে গেছে। কি

বলবে জানে না।

তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল রবিন। হেসে বলল, 'গোয়েন্দাগিরির ব্যবসায় আর পোষাচ্ছে না। তাই ক্যাটারিং ধরেছি।'

'খুব ভাল করেছ,' হরর ছবির সংলাপ বলছেন যেন পরিচালক। 'তবে মুভি বিজনেস থেকে দূরে থাকবে। যদি হৃৎপিণ্ডে কাঁচির খোঁচা খেতে না চাও। হিরোকে নিয়েই বড় বিপদে আছি এমনিতেই। আর ঝামেলা বাড়িও না।'

'বুঝলাম না, মিস্টার রিডার?' কিশোর বলল।

'ডিলনের জন্যে এই পার্টি দিয়েছি। যাতে সে আসে। মন ভাল হয়। আবার অভিনয় করে সাফোকেশন টু-তে। কি জবাব দিয়েছে জান? সিয়াও। আউ রিভোয়া। হ্যাসটা লুয়েগো। শ্যালম। নানা ভাষায় এই কথাগুলোর একটাই মানে, বিদায়।'

'ডিলন কোথায় জানেন?'

'পুলের পানির তলায় থাকতে পারে। কিংবা আমার টরচার চেম্বারে। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ওদিকটাতেই যেতে দেখেছি।'

গোল একটা ঘোরান সিঁড়ি দেখালেন রিডার। নিচে একটা ঘর রয়েছে। সেখানে অত্যাচার করার প্রাচীন সব অ্যানটিক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখা গেল অ্যাঞ্জেলা আর ডিলনকে।

'বেন,' তিন গোয়েন্দাকে চিনতে পেরে হেসে বলল অ্যাঞ্জেলা, 'ওরা গোয়েন্দা। তোমাকে অনেক খুঁজেছে।'

'তাই নাকি?' হাসি মুখে বলল বটে ডিলন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তেমন আন্তরিক মনে হল না।

'ওই কিডন্যাপিংটা নিশ্চয় খুব বাজে ব্যাপার হয়েছে,' রবিন বলল আলাপ জমানর ভঙ্গিতে।

কথাটার জবাব না দিয়ে কর্কশ গলায় ডিলন বলল, 'তোমরাই পটারকে অপমান করতে গিয়েছিলে?'

'অপমান?' আকাশ থেকে পড়ল যেন মুসা, 'বলেন কি? আমি তাঁর রেসলিঙের মস্ত বড় ভক্ত। অপমান করতে পারি?'

'টেলিভিশনে আপনার সাক্ষাৎকার দেখার পর থেকেই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে মরে যাচ্ছি, মিস্টার ডিলন,' কিশোর বলল নিরীহ কণ্ঠে। 'আপনি বলেছেন, অন্ধকারে আপনি বুঝতে পারেননি কিডন্যাপাররা কজন ছিল। তাদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। গলা শুনেও মানুষ গণনা করা যায় অনেক সময়।'

মাথা নাড়ল ডিলন। 'ওই ব্যাটারা অনেক চালাক। কেবলই কণ্ঠস্বর বদল করেছে। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। অনেক বড় অভিনেতা ওরা, আমার ওস্তাদ।' চোখের পাতা সামান্যতম কাঁপল না ওর। শান্ত, স্বাভাবিক রয়েছে।

'একটা স্বর নকল করে শোনাতে পারেন?'

'দেখ, বেশি চালাকি...' লাফ দিয়ে একটা পুরানো উঁচু চেয়ার থেকে নেমে পড়ল ডিলন, ওটাতে বসিয়ে অত্যাচার করা হত মানুষকে।

তার হাত চেপে ধরল অ্যাঞ্জেলা। 'আরে থামো থামো, ওরা তোমার উপকারই করতে চেয়েছে।'

'আপনার জন্যে খুবই সহজ কাজ,' ডিলনের ওই আচরণ যেন দেখেও দেখেনি কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'কারণ আপনি বড় অভিনেতা। যে কোন লোকের স্বর নকল করে ফেলতে পারবেন। এভাবেই বলুন না, হাল্লো, পটার? কেমন আছ, পটার? তারপর এই কথাগুলো আবার আপনার স্বাভাবিক স্বরে বলুন। শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'বলো না, বেন,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'ছেলেগুলো এত করে যখন বলছে।'

বলল ডিলন। একবার অন্য স্বরে, একবার নিজের আসল স্বরে। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। এই কণ্ঠ তার চেনা। অলিংগারের অফিসে রেডিয়াল বাটন টিপে ফোন করার সময় ওপাশ থেকে এই স্বরই শুনতে পেয়েছিল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। জবাবে কিশোরও ঝাঁকাল।

'আপনার ছবি দেখেছি। সিনেমা,' কিশোর বলল। 'তাতে বেঁধে রাখতে দেখেছি। কিডন্যাপাররাও কি বেঁধে রেখেছিল সারাক্ষণ?'

ঢিলেঢালা একটা হাফ-হাতা টারকুইজ শার্ট পরেছে ডিলন। চট করে একবার কব্জির দিকে তাকাল। দাগটাগ কিছু নেই। আড়চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল কেবল।'

সাংঘাতিক চালাক তো ব্যাটা, ভাবল মুসা। 'কাচের ব্যাপারটা কি বলুন তো? এত কাচ?'

'কিসের কাচ?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'আপনার সৈকতের ধারের বাড়িতে। সারা ঘরে কাচ ছড়িয়ে ছিল।'

হঠাৎ ঘরের সমস্ত আলো মিটমিট করতে শুরু করল, জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে।

'এই, সবাই স্ক্রিনিং রুমে চলে আসুন,' মাইক্রোফোনে বললেন রিডার। সব ঘরেই স্পিকার লাগান রয়েছে, তাতে শোনা গেল তাঁর কথা। 'আপনাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'চলো,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল ডিলন। 'ছেলেগুলো বিরক্ত করে ফেলেছে আমাকে।'

'কাচের ব্যাপারটা বললেন না তো মিস্টার ডিলন?' মুসা নাছোড়বান্দা।

'আমি কি করে বলব?' খেঁকিয়ে উঠল ডিলন। 'আমি কি দেখেছি নাকি? ধরেই আমার মাথায় একটা বস্তা টেনে দিয়ে ঢেকে ফেলল।' ঠেলে মুসাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাঞ্জেলার হাত ধরে টানল সে। 'কাচ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমি তো ভেবেছি আর কোনদিনই ফিরতে পারব না। একটা কথা শোনো, কাজে লাগবে। বড় বেশি ছোঁক ছোঁক কর তোমরা। ভাল নয় এটা।' অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ঘোরান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল টরচার চেম্বার থেকে।

'এটাই চেয়েছিলাম,' কিশোর বলল। 'ওকে নার্ভাস করে দিতে পেরেছি।'

অত্যাচার করার ভয়াবহ যন্ত্রগুলোর দিকে তাকাল মুসা। 'এ ঘরে এসে কে

নার্ভাস হবে না!'

'নার্ভাস হলে লাভটা কি?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'আমরা চেয়েছি ও ভুল করুক। বেফাঁস কিছু বলুক। যাতে ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে ধরতে পারি। তা তো করল না। পুরোপুরি ঠাণ্ডা রইল। ওর কিছু করতে পারব না।'

ওরা তিনজনও উঠে এল ওপরতলায়। স্ক্রিনিং রুমে বড় একটা সিনেমার পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাক রিডার।

বক্তৃতা দেয়ার ঢঙে বলছেন, '...আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যেই এখানে জমায়েত হয়েছি। ডিলন যে নিরাপদে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে এটা জানানোর জন্যে। দুনিয়া কোন দিনই জানতে পারবে না, মৃত্যুর কতটা কাছে চলে গিয়েছিল এতবড় একজন অভিনেতা। তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। আরও খুশি হব যদি ছবিটা শেষ করতে পারি।'

কেউ হাসল, কেউ কাশল, কেউ কেউ দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পরের দিকে।

'এসব তো আমরা জানি,' চিৎকার করে বলল একজন। 'সারপ্রাইজটা কি?'

'সারপ্রাইজ?' হাসছেন রিডার। হাত কচলাচ্ছেন। 'সেটা একটা গোপন ব্যাপার। আমাদের সবারই কিছু না কিছু গোপনীয়তা আছে। ডিলনেরও আছে। সেটা গোপন রাখাই ভাল।'

কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা, ভাল করে তাকাল ডিলনের মুখের দিকে। ভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। লোকটা সত্যিই বড় অভিনেতা, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না সে।

'ডিলন এই প্রথম আমার ছবিতে কাজ করছে না,' রিডার বলছেন, 'আরও করেছে। তার প্রথম ছবিটাই পরিচালনা করেছি আমি।'

'আর বলবেন না!' দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশ হওয়ার অভিনয় করল ডিলন। 'ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের কথা বলছেন তো? ছবিটা মুক্তিই দিতে দিল না স্টুডিও। ওই ভয়ঙ্কর বোমা ফাটানোর দৃশ্যটাই এর জন্যে দায়ী। ওফ্ বিচ্ছিরি!'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রিডার। 'আমারও একই অবস্থা হয়েছিল ওই ছবি করতে গিয়ে। লোকে আমার দিকে ফিরেও তাকাত না তখন। বড় পরিচালক বলা তো দূরের কথা, এখন যেমন বলে।' থামলেন তিনি। তাকালেন শ্রোতাদের দিকে। হাততালি আর প্রশংসা আশা করলেন যেন। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, ডিলন জানে না কথাটা, ওই ছবির একটা প্রিন্ট আমার কাছে আছে। সেটাই দেখান হবে এখন।'

এইবার হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল শ্রোতারা।

'লাইটস! ক্যামেরা! অ্যাকশন!' শুটিঙের সময় যেভাবে চেঁচানো সে রকম করে চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার।

আলো নিভে গেল। রোম খাড়া করে দেয়া বাজনা বেজে উঠল। পর্দায় ফুটল ছবি।

এক ভয়াবহ ছবি। বোর্ডিং স্কুলে ছাত্ররা বার বার ভ্যাম্পায়ারের শিকার হতে লাগল। পিশাচটাকে জ্যান্ত করে তুলেছিল কয়েকটা ছেলে। বহুদিন বন্ধ করে রাখা

পাতাল ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, পেয়ে গিয়েছিল একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আর একটা কঙ্কাল, ওই পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল কি করে জ্যান্ত করে তুলতে হয় ভ্যাম্পায়ারকে। খেলার ছলে ওরা করে ফেলেছিল কাজটা, সত্যিই যে জেগে উঠবে পিশাচ কল্পনাই করতে পারেনি।

প্রথমেই ভ্যাম্পায়ারের কামড় খেল ডিলন। হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ার। ফ্যাকাসে চেহারা, তাতে সবুজ আভা, চোখের চারপাশে কালো দাগ, চোয়াল বসা, কালো আলখেল্লা পরা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার আতঙ্কের ঝড় তুলল যেন পর্দায়।

হঠাৎ আঙুল দিয়ে রবিন আর কিশোরের পিঠে খোঁচা মারল মুসা। কিশোরেরটা এতই জোরে হয়ে গেল, উফ করে উঠল সে।

'আমি যা দেখেছি তুমিও দেখেছ?' ওর কানে কানে বলল মুসা, 'মনে করতে পার?'

অন্ধকারেই উজ্জ্বল হলো কিশোরের হাসি। 'ভাল মত। এই পোশাকই পরেছিল সে, হ্যালোউইনের রাতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সময়।'

ষোলো

একটা মুহূর্ত; দীর্ঘ, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা নীরব মুহূর্ত অনড় হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। নড়তে পারল না। চোখ আটকে রইল পর্দায়, যেখানে ভ্যাম্পায়ারের সাজে সাজা বেন ডিলন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। রক্ত শোষণ করছে একের পর এক মানুষের।

'আমি চেয়েছিলাম,' রবিন বলল। 'একটা ভুল করুক ডিলন। মাত্র একটা। তাহলেই ধরতে পারতাম।'

'করে ফেলেছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল। 'হ্যালোউইনের দিনে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছে সেরাত্তে কোথায় ছিল প্রমাণ করতে পারব আমরা। কিডন্যাপারটা আটকে রাখেনি, এটা তো শিওর।'

উত্তেজিত কিশোরও হয়েছে, তবে অনেক বেশি সতর্ক রয়েছে সে। 'ভিডিও টেপে রেকর্ড করা রয়েছে, চুরি করে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল একজন লোক। সেই লোকই যে ডিলন, প্রমাণ করতে পারছি না আমরা। তবে তাড়াহুড়া করলে হয়তো বিশেষ একজনকে ভড়কে দিতে পারব।'

'কেসটা আবার ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে আমার,' মুসা বলল।

'লাগবেই। কারণ একটা মেজর রোল প্লে করতে হবে তোমাকে।'

মুসার মেজর রোলটা হল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে ভিডিও টেপটা নিয়ে আবার বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পার্টিতে ফিরে আসা। ছবিটা শেষ হওয়ার আগে।

রকি বীচের দিকে তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়েছে মুসা। বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেছে তার। ব্রেকটা গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে, অ্যাকসিলেরেটর পুরোটা না নেমে মাঝপথেই আটকে যাচ্ছে। বিরক্ত লাগে মুসার। এত সময় ব্যয় করে গাড়িটার পেছনে, সব কিছু ঠিকঠাক রাখতে চায়, তারপরেও প্রয়োজনের সময়

গোলমাল করতে থাকে। সন্দেহ হতে লাগল তার, পৌঁছতে পারবে তো সময়মত?

ইয়ার্ডে পৌঁছে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ক্যাসেটটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল। যেন প্রার্থনা করল সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্যে।

তারপর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ছুটল আবার বেল এয়ারের দিকে।

ভূতুড়ে চেহারার ছমছমে পরিবেশের সেই বাড়িটাতে যখন পৌঁছল, দেখল তখনও ছবি চলছে। নিঃশব্দে স্ক্রিনিং রুমের পেছনে প্রোজেকশন বুদে ঢুকে পড়ল মুসা। ঘরটা খালি। প্লেয়ারে ক্যাসেটটা ভরল সে। কয়েকটা বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল প্রোজেকটরের ফিল্ম। ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সেই জায়গা দখল করল ভিডিও প্লেয়ার, কয়েকটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আবার ছবি ফোটাল পর্দায়।

ক্যাসেটটা চালু করে দিয়েই দৌড়ে স্ক্রিনিং রুমে চলে এল মুসা, রবিন আর কিশোরের পাশে।

হাসাহাসি শুরু করেছে দর্শকরা।

একজন বলল, 'দারুণ এডিটিং করেছ তো হে জ্যাক। কোত্থেকে তুললে এটা?'

'ঘুমিয়ে ছিলে নাকি তখন?' বিরক্ত হয়ে বলল আরেকজন। 'মনে হচ্ছে ক্যামেরাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় চলে গিয়েছিলে? ফোকাসিঙের এই অবস্থা কেন?'

ট্রেলারের দরজায় লাথি মারতে দেখা গেল ডিলনকে।

'কি ব্যাপার, ডিলন?' বলে উঠল এক মহিলা। 'এরকম করলে কেন? ঢুকতে বাধা দিয়েছিল নাকি কেউ? দেখা তো যাচ্ছে না।'

খুশি হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। ডিলনের নাম বলেছে মহিলা। তার মানে ওরা সফল হতে চলেছে।

'কার কথা বলছেন?' গলায় জোর নেই ডিলনের, 'ওটা আমি নই...'

জ্বলে উঠল ঘরের সব আলো। ডিলনের দিকে ঘুরে তাকালেন রিডার। চোখে খুনীর দৃষ্টি। 'এগুলো কখন তুললে?'

নীল একটা স্কটিক হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে মরিয়া হয়ে বলল ডিলন, 'আমি নই! ওই লোকটা আমি নই, বলছি না!'

'তুমি নও মানে? নিশ্চয় তুমি! কানা হয়ে গেছি নাকি আমরা!'

'আমি নই,' দুর্বল কণ্ঠে আবার বলল ডিলন।

'তাহলে কে?' কোমল গলায় জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা ডোভার। 'ছবিটা শেষ করার পরেও ওই পোশাক তোমার কাছে রেখে দিয়েছিলে। কেন অস্বীকার করছ?'

পার্টিতে পটার বোনহেডকেও দাওয়াত করা হয়েছে। উঠে দাঁড়াল সে। দু'হাত দু'পাশে ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে শান্ত হতে বলল দর্শকদের। বলল, 'অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের মত লাগলেও আসলে আমরা নই।'

'চমৎকার, বোনহেড,' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কণ্ঠে। 'ঠিকই বলেছেন। এই

যেমন, এখনও গা থেকে টু-টন টিটানের গন্ধ ধুয়ে ফেলতে পারেননি আপনি।'

তাড়াহুড়ো করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল বোনহেড।

অস্বস্তিতে কেবলই চেয়ারে উসখুস করছে ডিলন।

'হচ্ছেটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' রিডার বললেন।

দ্রুত ঘরের সামনের দিকে চলে এল কিশোর, রবিন আর মুসা, যেখানে ওদেরকে সবাই দেখতে পাবে। পর্দাটার কাছে।

'মিস্টার রিডার,' বলতে লাগল কিশোর, 'যে টেপটা দেখলেন ওটা আমাদের। নয় দিন আগে হ্যালোউইনের রাতে তোলা। রকি বীচে আমাদের ট্রেলারে ঢুকেছিল ডিলন, চুরি করে।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। অবিশ্বাসের হাসি হাসল কেউ কেউ।

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ জানাল অ্যাঞ্জেলা। 'হ্যালোউইনের তিন দিন আগে কিডন্যাপ করা হয়েছে বেনকে।'

'কোন কিডন্যাপিংই হয়নি,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'পুরোটাই ধাপ্পাবাজি।'

হঠাৎ ব্রাউন অলিংগারের ঘড়ি অ্যালার্ম দিতে শুরু করল, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'এসব ফালতু কথা শোনার কোন মানে হয় না। নিশ্চয় নেশা করে এসেছে ছেলেগুলো। কিডন্যাপ অবশ্যই হয়েছিল। জ্যাক, দেখছ কি? বের করে দাও ওগুলোকে।' দরজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করলেন তিনি। পথ আটকাল মুসা।

'একটু দাঁড়ান, মিস্টার অলিংগার,' কিশোর বলল, 'আপনিও জড়িত আছেন এতে।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেছে রিডারের।

'বেন ডিলনকেই জিজ্ঞেস করুন না,' মুসা বলল।

উঠে দাঁড়াল ডিলন, যেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্যেই। কিন্তু সবগুলো চোখ তার দিকে ঘুরে যাওয়ায় বেরোতে আর পারল না। অলিংগারের দিকে তাকাল। তারপর একে একে কিশোর, মুসা আর রবিনের দিকে। ভঙ্গি আর দৃষ্টি দেখে মনে হলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে খেপা জানোয়ার।

এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে বসে পড়তে বাধ্য হলো আবার, তবে চেয়ারে না বসে বসল চেয়ারের হাতলের ওপর। 'বেশ, স্বীকার করছি, ওটা কিডন্যাপ ছিল না। কিডন্যাপ করা হয়নি আমাকে। জোক। রসিকতা।'

'জোক!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন রিডার, 'আমার ছবিটাকে স্যাবোটাজ করে দিয়ে রসিকতা! এরকম একটা কাজ কি করে করতে পারলে!'

বসে পড়লেন অলিংগার। চোখে আগুন। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব ঝামেলা না করে আসলে তোমাকে খুন করা উচিত ছিল, জ্যাক। যাতে আর কোন দিন কোন ছবি বানানোর পাগলামি করতে না পারো!'

'বোঝার চেষ্টা করুন, রিডার,' ডিলন বলল, 'ছবির সব চেয়ে ভাল অংশগুলোও কিছু হচ্ছিল না। এ জিনিস পুরোপুরি ফ্লপ হতে বাধ্য। সাফোকেশন টু মুক্তি পেলে হাসাহাসি করত লোকে। বেশি বাজেটের ছবি করার ক্ষমতাই আপনার

নেই, এটা মেনে নেয়া উচিত।'

'কে বলে?' আরও রেগে গেলেন রিডার।

'ডিলন বলে, আমি বলছি, দু'জন তো হয়ে গেল,' অলিংগার বললেন। 'খুঁজলে আরও অনেককে পেয়ে যাবে।'

কঠিন হাসি হাসল ডিলন। তার্কীল ওর নীল স্ফটিকের দিকে। 'কি কি গোলমাল হয়েছে, খুলেই বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। হপ্তা দুই আগে আমি আর ব্রাউন কয়েকটা ডেইলি দেখছিলাম। অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল সে। শেষে ঠিকই করে ফেলল, এ ছবি করা যাবে না। আফসোস করে বলতে লাগল, অনেক টাকা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। ছবি শেষ করতে গেলে আরও অনেক বেশি যাবে। তখন আর মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া গতি থাকবে না। আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়া উচিত, নইলে ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের মতই আলমারিতে পড়ে থাকবে। আমিও বুঝলাম, ওই ছবি মুক্তি পেলে আমারও ক্যারিয়ার শেষ। কাজেই ব্রাউন যখন প্ল্যানটা করল, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলাম। মন খারাপ করবেন না, রিডার, আর কোন উপায় ছিল না।'

'করব না,' শীতল কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রিডার, 'যখন তুমি আর অলিংগার জেলে যাবে।'

'জেল?' চেয়ার থেকে উঠে পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিলন। 'কোন সম্ভাবনা নেই। কাজটা ভাল করিনি, ঠিক, কিন্তু অপরাধ করেছি বলে মনে হয় না। আমিই ভিকটিম, আমিই কিডন্যাপার। আমার বাড়ি আমিই তছনছ করেছি। পুলিশ কাকে ধরবে?'

'কাচ,' বলে উঠল মুসা। মনে হচ্ছে, আবার দম আটকে আসছে। 'কাচগুলো ভাঙল কে? এল কোত্থেকে?'

'ওটা ভাঙতেই হলো। স্ফটিকগুলো ছাড়া নড়ি না আমি। সাথে করে নিতে হল। ওগুলো একটা কাচের বাক্সে রাখতাম। কিডন্যাপের খবর জানাজানি হলে পুলিশ আসবে, বাক্সটা দেখে সন্দেহ করবে কি ছিল ওটাতে। জেনে যাবে স্ফটিক রাখা হত। আরও সন্দেহ হবে। স্ফটিকগুলো গেল কোথায়? আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যেতে দেবে না কিডন্যাপাররা?'

'কাজেই সন্দেহের অবকাশই রাখলেন না আপনি,' কিশোর বলল, 'বাক্সটা ভেঙে রেখে গেলেন। পুরো দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, ওদিকে সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবেন আপনি। বুদ্ধিটা মন্দ না।'

'এই কিডন্যাপিঙের বুদ্ধিটা ভাল হয়নি, যাই বল,' মুখ বাঁকাল ডিলন। 'র‍্যানসমের টাকা আনতে প্লে গ্রাউণ্ডে যেতে হল। সত্যিই ওটা কিডন্যাপিঙ এটা বোঝানর জন্যে করতে হয়েছিল এসব। ঠিকঠাক মতই সব করে বেরিয়ে আসতে পারতাম, বাগড়া দিয়ে বসলে তোমরা। পিছু নিলে। ঠেকানোর জন্যে মারামারিটা করতেই হলো। বাড়ি মেরে বসলাম সুটকেস দিয়ে কাকে যেন।'

'হ্যাঁ, আমাকেই মেরেছেন,' মুসা বলল।

'তা নাহয় হলো,' কিশোর বলল। 'কিন্তু হ্যালোউইনের রাতে আমাদের

হেডকোয়ার্টারে কেন ঢুকেছিলেন? কেসটা হাতে নিয়েছি তখনও কয়েক ঘণ্টাও হয়নি।'

'ব্রাউন বলেছে তোমাদের কথা। ঘাবড়ে গেলাম। কারণ তোমাদের নাম শুনেছি আমি। শুনেছি, তিন গোয়েন্দা কারও পিছু নিলে শেষ না দেখে ছাড়ে না। কাজেই শুরুতেই তোমাদের ভয় দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করেছিলাম।'

'তখনই মানা করেছি!' রাগে খেঁকিয়ে উঠলেন অলিংগার। 'এটা করতে গিয়েই ধরাটা পড়লে! সব সময়ই বাড়াবাড়ি করে বসো তুমি!'

'করেছি, ভুল করেছি, কি আর করব। তবে অপরাধ করিনি। একটা ছবি মুক্তি না পেলে হলিউডের ক্ষতি হবে না, দর্শকরা পাগল হয়ে যাবে না। বরং ছবিটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার আর কয়েক কোটি টাকা বাঁচালাম।'

'র‍্যানসমের টাকাগুলো কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার কাছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি ব্রাউনকে যত টাকা পে করেছে ওটা তার অর্ধেক। ফিরিয়ে দিলেই হবে এখন।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, হবে না। অপরাধ যা করার করে ফেলেছেন। শাস্তি ভোগ করতেই হবে। টেলিভিশনেও লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে, রিপোর্টার আর পুলিশের সামনে মিথ্যে কথা বলেছেন। পুলিশ আপনাকে ছাড়বে ভেবেছেন? ইনসিওরেন্সকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টার অপরাধে অলিংগারও পার পাবেন না।'

অলিংগারের দিকে ঘুরে গেল রিঙারের চোখ। 'প্রযোজকদের বিশ্বাস নেই যে বলে লোকে, এমনি এমনি বলে না। সব সময় ঠকানর চেষ্টা করে, দরকারের সময় টাকা দিতে চায় না, অথচ ছবি কেন শেষ হয় না সেটা নিয়ে চাপাচাপির সীমা নেই। অ্যাকটরগুলোও সব ফাঁকিবাজ। কিছুতেই কথা রাখবে না।'

'আর পরিচালকগুলো সব পাগল,' তিক্তকণ্ঠে বলল ডিলন।

নীরব হয়ে ছিল ঘরটা। হঠাৎ একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'অ্যাঞ্জেলা, কোথায় যাও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল ডিলন।

প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে অ্যাঞ্জেলা। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে আর একটা সেকেণ্ড থাকতে চাই না। এরপর কি হবে জানি। পুলিশ আসবে, অপরাধীদের হাতকড়া দিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সব ভজঘট করে দিয়েছ, বেন। সিনেমার লোক তুমি, সিনেমাতে থাকলেই ভাল করতে।'

অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে যেতে অন্যেরাও উঠে পড়তে লাগল। বেরিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। পার্টি ভেঙে গেল। চিৎকার করে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করলেন অলিংগার, তাঁর কথা শুনে যেতে বললেন। কেউ থাকল না। তাঁর কৈফিয়ত শোনার আগ্রহ নেই কারও।

'আর কেউ না শুনলেও আপনার কথা পুলিশ শুনবে, মিস্টার অলিংগার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ঘড়ি দেখল। 'ফোন করে দিয়েছি। চলে আসবে।'

সব কথা বলতে অনেক সময় লেগে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করল পুলিশ, জবাব লিখে নিল। ভূতুড়ে চেহারার বাড়িটা থেকে যখন বেরোল তিন

গোয়েন্দা, পুবের আকাশে তখন সূর্য উঁকি দিয়েছে। রকি বীচে ফিরে চলল ওরা। কয়েক ঘণ্টা বাদেই স্কুল শুরু হবে। স্কুলের শেষে জরুরী কাজ আছে মুসা আর রবিনের।

কয়েকদিন পর ব্রাউন অলিংগারের একটা চিঠি নিয়ে হেড-কোয়ার্টারে ঢুকল মুসা। ডেস্কের ওপর বিছিয়ে দিল, যাতে রবিন আর কিশোর পড়তে পারে। লেখা রয়েছেঃ

মুসা,

প্রথমেই স্বীকার করে নিই, তোমাদের অবহেলা করে ভুল করেছিলাম। অন্যায় যে করেছি সেটাও স্বীকার করছি। তোমরা শুনলে হয়ত খুশিই হবে, উকিলকে দিয়ে বীমা কোম্পানির সঙ্গে একটা মিটমাটে আসতে পেরেছি আমি। রিডারের সঙ্গেও রফা করে নিয়েছি। আগামী তিন-চার মাস আর কোন কাজ করতে পারব না, তবে আশার কথা, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কেলেঙ্কারির কথা বেশিদিন মনে রাখে না লোকে। আগামী বসন্ত থেকেই আবার কাজ শুরু করতে পারব। চিঠিটা সে কারণেই লেখা। অবশ্যই ছবি তৈরি করতে হবে আমাকে, এটাই যখন ব্যবসা। ঠিক করেছি, পরের ছবিটা করব তিন গোয়েন্দার গল্প নিয়ে। রহস্য গল্প। কিডন্যাপিঙের গল্প। সত্যি ঘটনা যেটা এবার আমরা ঘটালাম। ছবিটার কি নাম দেয়া যায়, বল তো? টেবর ইন দা গ্রেডইয়ার্ড? ভালই হয়, কি বলো? হ্যাঁ, একটা দাওয়াত দিচ্ছি। আগামী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এসপেটোতে চলে এস, লাঞ্চ খাওয়াব। বিশ্বাস কর, এবার আর ওষুধ মেশান মিল্ক শেক খাওয়াব না।

—ব্রাউন অলিংগার।

চিঠি পড়া শেষ করে বলল রবিন, 'ওই লোককে আমি আর বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না,' চিঠিটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিল মুসা।

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। আবার শুরু হয়েছে দম আটকে আসার ব্যাপারটা। 'ওফ, শ্বাস নিতে পারছি না! যতবারই এই কেসটা নিয়ে ভাবতে যাই, এরকম হয়। দম আটকে আসতে চায়।'

'শান্ত হও, শরীর ঢিল করে দেয়ার চেষ্টা করো,' কিশোর বলল। 'কেন এরকম হয়, বুঝতে পারবে এখনই।'

'কি, কিশোর? জলদি বলো! হিপনোটিক সাজেশন? স্ফটিকের কারসাজি? বোনহেড জিন চালান দিতে জানে? কেন হয়?'

ডেস্কের ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করল কিশোর। তুলে দিল মুসার হাতে। 'এটা পড়েই রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছি। তুমিও পারবে। পড়ো।'

হেডলাইন পড়ল, নিচের লেখাটাও পড়ল মুসা। ঝুলে পড়ল চোয়াল। বিড়বিড় করল, 'বাতাসে পোলেন বেশি! অনেককেই ধরেছে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বলছে তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত বেশি

আক্রান্ত আর হয়নি লোকে।'

'তার মানে জিনটিন কিছু না! হে-ফিভারে ধরেছে! আমাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকানোর জন্যেই বোনহেড পাথর দিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, গোরস্থানে মাটি চাপা দেয়ার ভান করেছে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তাহলে যখনই কেসটার কথা ভাবি তখনই দম আটকানো ভাবটা হয় কেন?'

'সব সময় হয় না। আবার যখন না ভেবেছ তখনও হয়েছে এই অসুবিধে। ভালমত খেয়াল রাখলেই মনে থাকত।'

'স্ফটিকটা ধরলে তাহলে হাতে গরম লাগত কেন?'

'ওটাও বেশির ভাগই কল্পনা। আরেকটা ব্যাপার অবশ্য আছে। ওরকম পাথর পকেটে রেখে দিলে গায়ের গরমে গরম হয়ে থাকে। হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরও গরম হয়ে যায়। মনে হয়, অলৌকিক ক্ষমতাই আছে ওটার। আর যদি কেউ মাথায় ঢুকিয়ে দেয়, আছে, তাহলে তো কথাই নেই।'

'হুঁ!' বলতে বলতেই গলা চেপে ধরল মুসা, হাঁসফাঁস করতে লাগল।

'কি, আবার আটকাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।

'তাহলেই বোঝো।'

—০—